भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या 182 Qa
Class No.
पुस्तक संख्या 862·1-22
Book No.
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—59 LNL/64—1-11-65—100,000.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी। दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन ६ पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

रा० पु० ४४
N. L. 44.
MGIPC—S4—14 LNL/64—6-5-65—50,000.

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

দ্বাদশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮১০ শক।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮৯। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

NATIONAL LIBRARY
No. L-3456
D. 19-4-67
...TTA

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৫৩৭ সংখ্যা।

নব-বর্ষ ১
সমাজের বিষম সমস্যা ৩
ঈশ্বর লাভ ৬
প্রেরিত ৯
শান্তিনিকেতন ১১
ভক্ত প্রহ্লাদ ১৪
ঈশ্বর অসীম ১৬

জ্যৈষ্ঠ ৫৩৮ সংখ্যা।

আত্মার অমায়িক সহজ ভাব ১৭
বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ২২
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা ২৬
যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন ২৭
শিক্ষা ৩০
আলোচনা ৩৫

আষাঢ় ৫৩৯ সংখ্যা।

আত্মা এবং পরমাত্মা ৩৭
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ৪০
বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান ৪৪
ব্রাহ্মের আদর্শ ৪৮
দ্বৈতাদ্বৈত বাদ ৪৯
ঐশ্বরিক প্রেম ৪৯
সাধু পার্কারের ধর্ম্ম ৪৯
প্রার্থনা ৫০
ভক্ত প্রহ্লাদ ৫১
বিবিধ ৫৪
পত্র ৫৪

শ্রাবণ ৫৪০ সংখ্যা।

ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৫৭
বাক্যামৃতকণা ৬১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ৬২
আত্মা ও পরমাত্মা ৬৮
ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা ৭০
মৃত্যু ৭১
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ৭৩

ভাদ্র ৫৪১ সংখ্যা।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ৭৭
অধিকার ৮৮
নীতি ৯১

আশ্বিন ৫৪২ সংখ্যা।

আত্মশক্তি ৯৯
নীতি ১০১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ১০৫
মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ১১৪

কার্ত্তিক ৫৪৩ সংখ্যা।

মানবীকরণই বটে ১১৭
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ১৩৪
সমালোচনা ১৩৫

অগ্রহায়ণ ৫৪৪ সংখ্যা।

মানবীকরণই বটে ১৩৭
কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৫৬
শান্তিনিকেতন ১৬৩

পৌষ ৫৪৫ সংখ্যা।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৬৫
বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৭৭

মাঘ ৫৪৬ সংখ্যা।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন ... ১৮১
উপদেশ ১৯৪
ব্যাখ্যানমঞ্জরী ১৯৯
পত্র ২০০

ফাল্গুন ৫৪৭ সংখ্যা।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ... ২০১

চৈত্র ৫৪৮ সংখ্যা।

বালি ধর্ম্ম সভা ২১৭
আস্তিক বুদ্ধি ২২২
কালনা ব্রাহ্মসমাজ ২২৮
দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ... ২৩০

অকারাদি বর্ণক্রমে দ্বাদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অধিকার	৫৪১	৮৮
আত্মার অমায়িক সহজ ভাব	৫৩৮	১৭
আত্মা এবং পরমাত্মা	৫৩৯	৩৭
আত্মা ও পরমাত্মা	৫৪০	৬৮
আত্মশক্তি	৫৪২	৯৭
আলোচনা	৫৩৮	৩৫
আস্তিক বুদ্ধি	৫৪৮	২২২
ঈশ্বর লাভ	৫৩৭	৬
ঈশ্বর অসীম	৫৩৭	১৬
উপদেশ	৫৪৬	১৯৪
উনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৭	২০১
ঐশ্বরিক প্রেম	৫৩৯	৪৯
কালনা ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৮	২২৮
কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৪	১৪৬
কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৫	১৬৫
কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন	৫৪৬	১৮১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪০	৬২
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪১	৭৭
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫৪২	১০৫
দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	৫৪৮	২৩০
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ	৫৩৯	৪৯
ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা	১৪০	৭০
নব-বর্ষ	৫৩৭	১
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা	৫৩৮	২৬
নিবৃত্তি	৫৪২	৯৯
নীতি	৫৪১	৯১
নীতি	৫৪২	১০১
পত্র	৫৩৯	৫৪
পত্র	৫৪৬	২০০
প্রার্থনা	৫৩৯	৫০
প্রেরিত	৫৩৭	৯
বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ	৫৩৮	২২
বাক্যামৃতকণা	৫৪০	৬১
বালি ধর্ম্ম সভা	৫৪৮	২১৭
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪০	৭৩
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪৩	১৩৪
ব্যাখ্যানমঞ্জরী	৫৪৬	১৯৯
বিবিধ	৫৩৯	৫৪
বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪৫	১৭৭
ব্রাহ্মের আদর্শ	৫৩৯	৪৮
বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান	৫৩৯	৪৪
ভক্ত প্রহ্লাদ	৫৩৭	১৪
ভক্ত প্রহ্লাদ	৫৩৯	৫১
ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৪০	৫৭
মানবীকরণই বটে	৫৪৩	১১৭
মানবীকরণই বটে	৫৪৪	১৩৭
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৩৯	৪০
মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য	৫৪২	১১৪
মৃত্যু	৫৪০	৭১
যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন	৫৩৮	২৭
শান্তিনিকেতন	৫৩৭	১১
শান্তিনিকেতন	৫৪৪	১৬৩
শিক্ষা	৫৩৮	৩০
সমাজের বিষম সমস্যা	৫৩৭	৩
সমালোচনা	৫৫৩	১৩৫
সাধু পার্কারের ধর্ম্ম	৫৩৯	৪৯

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৩৭ সংখ্যা
১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

নব-বর্ষ।

পূর্ব্বে কেবল এক মহাশূন্য ছিল। এই মহাশূন্যকে স্বীয় কুক্ষি মধ্যে রাখিয়া এক অবাতস্পন্দিত মহাপ্রাণ জাগিতেছিলেন। তখন এই সমস্ত নামরূপ কিছুই ছিল না কেবল এক নিবিড় অন্ধকার। মনুষ্যের কল্পনায় ইহাই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। যখন নাম রূপ কিছুই ছিল না তখন সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মের প্রেমের বিকাস হয়। এই প্রেম হইতেই এই সমস্ত ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইহাই সৃষ্টি। সৃষ্টির মুলে কেবল একমাত্র ব্রহ্মের প্রেম বিরাজ করিতেছে। ফলত প্রেমেই সৃষ্টি এবং প্রেমই স্থিতি। ঐ দেখ তরুণ সূর্য্য জীবন ও জ্যোতি বিস্তার করিবার জন্য কেবল সেই প্রেমে আরক্ত হইয়াছে। এই সুমন্দ প্রাভাতিক বায়ুহিল্লোল সেই প্রেমেই সুস্নিগ্ধ। এই সকল বৃক্ষ ও পুষ্প চতুর্দ্দিকে সেই প্রেমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিতেছে। স্রোতস্বতী অত্যুচ্চ শৈলশিখর হইতে সেই প্রেম প্রবাহিত করিয়া মহারবে সমুদ্রের বক্ষে গিয়া মিশিতেছে। ফলত যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রেমের ব্যাপার। কিন্তু সৃষ্টের মধ্যে কেবল মনুষ্যই ইহা বুঝিতে পারে। মনুষ্যসৃষ্টি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা। ভৌতিক তম যেমন তাহাকে আবরণে নিক্ষেপ করিতেছে আধ্যাত্মিক সত্ত্ব তেমনি তাহাকে প্রকাশে আনিতেছে। এমন বিরোধী বিচিত্র সৃষ্টি আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বের উদ্রেকই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং ইহাতেই সৃষ্টির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই মনুষ্যজন্মে যদি কেবল রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করি তবে তো ভৌতিক তমেরই জয়জয়কার হয়। অতএব প্রত্যেকেরই এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বগুণের উদ্রেকের জন্য যত্ন করিতে হইবে। তম প্রকৃতির হস্তে কেবল অন্ধভাবে ভোগ আর এই সত্ত্বের হস্তে পরীক্ষা। ইহা আমাদিগকে বিষয়ের মুল প্রদেশে লইয়া যায় এবং সৃষ্টিতত্ত্বে কেবলই ব্রহ্মের একমাত্র প্রেমের বিলাস দেখাইয়া নিরস্ত হয়। তখন বাহ্য বিষয়ে আর আমাদিগের প্রীতি থাকে না। আমরা অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে বলিয়া উঠি, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ

অন্তরতরং যদয়মাত্মা। যাঁর সৃষ্টির মূলে এত প্রেম, যিনি কেবল আমাদিগকেই সুখী করিবার জন্য এই ভূতভৌতিকের মধ্যে নানা রূপ নানা রস নানা গন্ধের যোজনা করিয়াছেন, না জানি তিনি আমাদের কতই না প্রেমের বস্তু। তখন আমরা ইতর জন্তুর ন্যায় বিষয়রাজ্যে আর বদ্ধ থাকি না। তাহার অতীত প্রদেশে গিয়া প্রেম স্থাপন করি এবং তখনই বলিতে পারি তিনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সকল হইতে প্রিয়।

এই প্রেম সাধনই ধর্ম্ম সাধন। এই সংসারে প্রীতিস্থাপন করিলে বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে পরিহার করিতে পারে। পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ আসিয়া হৃদয়ের উত্থান ও পতন অবশ্যই সাধন করিবে। কারণ অনিত্য বস্তুতে আসক্তি এই রূপেই পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহার প্রতি প্রীতি কখনই মরণশীল হয় না। তবে কি কজ্জল লাগিবার ভয়ে কজ্জলের গৃহ এককালে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। না। যদি তোমার প্রীতি সংসার হইতে প্রত্যাহৃত ও ব্রহ্মে স্থাপিত হয় কিন্তু তুমি যে সমস্ত বস্তুতে অহর্নিশি পরিবৃত আছ তৎকালে সে সকল যে কেবল তোমার অগ্রাহ্য পরিহার্য্য হইবে এরূপ ভাবিও না। এই সংসার প্রেমময়ের অধিষ্ঠানেই প্রেমাস্পদ। এই সূত্রে তোমার চক্ষু ইহাতে আবার আকৃষ্ট হইবে এবং তোমার প্রীতি ব্রহ্মস্পর্শে পবিত্র যেন অগ্নিপরিশোধিত হইয়া ইহাতে পড়িবে। তখন ভোগ্যের মধ্যে অবশ্যই তোমার ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল কিন্তু তোমার চিত্ত সমস্ত অধ্রুবের হস্ত এড়াইয়া একমাত্র ধ্রুব প্রেমে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে সুতরাং ইহা তোমার পক্ষে অনাসক্তের বিষয়ভোগ। এইরূপে তোমার সকল সাংসারিক ব্যবহার নিষ্পত্তি হইবে এবং ইহার প্রত্যেক মূল শাখা পত্রে এক চির প্রেম জাগরূক দেখিয়া তোমার প্রীতি শতধা বহুধা হইয়া পড়িবে। ইহাই প্রীতির সম্প্রসারণ। মনুষ্যের মধ্যে যিনি এই বিশ্বপ্রেম লাভ করিতে পারেন তিনিই ধন্য।

এই সংসার যেমন সেই চির প্রেমের অধিষ্ঠানে প্রেমাস্পদ সেইরূপ সেই চির সত্তার অধিষ্ঠানেই ইহা সৎ। আমরা যে অণ্ডকটাহের অন্তর্গত ইহার সত্তা আপেক্ষিক সত্তা। ইহার একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুকে একটী দ্ব্যনুক আর একটী দ্ব্যনুককে একটী ত্রসরেণু আর একটী ত্রসরেণুকে এবং একটী পিণ্ড আর একটী পিণ্ডকে স্বীয় স্থিতি লাভের জন্য অপেক্ষা করে। এইরূপে এক সৌর জগৎ আর এক সৌর জগৎকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি লাভ করিতেছে। যদি কাহারও এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণের শক্তি থাকে তবে তিনি দেখিতে পাইবেন সকলেরই স্থিতি এইরূপ আপেক্ষিক স্থিতি। এখন দেখ, যদি সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবী না থাকে তখন তো পৃথিবী কিছুই নয় সূর্য্যই তো সব। এই রূপ সকলের স্থিতি যে মূল সত্তায় গিয়া সকল অপেক্ষার পরিসমাপ্তি করিতেছে তিনিই তো সব, অন্যান্যটা তো তাঁর নিকট কিছুই না। এই মূল নিত্য সত্তাই ব্রহ্ম। ফলত তিনি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থাকে না। যিনি এইরূপ চরম জ্ঞানে উপনীত হইয়াছেন তিনিই জলস্থলশূন্য সমস্ততেই এক পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান। ফলত ইহাই জ্ঞানের সম্প্রসারণ। বিশ্বের এই বিকারের মধ্যে যিনি জ্ঞানে এইরূপে সেই অবিকৃতকে দেখিতে পান তিনিই ধন্য।

ব্রাহ্মগণ! এইরূপে জ্ঞান ও প্রীতিকে প্রসারিত কর তাহা হইলেই অনাসক্তিতে তোমার সংসারভোগ হইবে। যতটুকু সংসারে আসক্তি সেই পরিমাণে স্বীয় নামযশের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহাতে সংসারের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আর যে পরিমাণে অনাসক্তি সেই পরিমাণে সাংসারিক সমস্ত পবিত্র ব্যবহার ব্রহ্মে অর্পণ করিতে তোমার মনে বল আইসে। ফলত ইহাই ধর্ম্মসাধন। আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্যাম কেশ শ্বেত হইয়াছে। দন্ত স্খলিত ও তুণ্ড গলিত হইয়াছে। আমাদের এই পার্থিব জীবন তো অবসান হইয়া আসিল। আজ যে বর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল হয় তো ইহাই অনেকের শেষ বর্ষ হইবে। আজ এই কদলীদলমণ্ডিত মণ্ডপের মুক্ত বায়ুতে যাতি যূথি মল্লিকার মনোমুগ্ধকর সৌরভে যাঁহাদের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া নবরর্ষের প্রাতঃকাল পবিত্র করিলাম,হায়! হয় তো আগামী বর্ষে তাঁহাদের সহিত এই আনন্দ আর ভোগ করিতে পাইব না। জীবন এইরূপই চঞ্চল। নলিনী-দল-গত-জলবৎ চঞ্চল। সংসারের সমস্তই চঞ্চল। আইস এই সমস্ত চঞ্চল অধ্রুবের বিনিময়ে সেই ধ্রুব পদার্থকে লাভ করিবার জন্য আজ হইতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে এখনও যে কএকটা দিন থাকিব যদি তার মধ্যে অন্তত একটী দিনও সেই প্রাণসখারে প্রাণ খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া একবারও ডাকিতে পারি তাহলেও আমাদের জন্ম সফল। অন্তর্যামী! তুমি সকলই জানিতেছ। তোমাকে আর আমরা কি জনাইব। তুমি আমাদের এই সাধু কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সমাজের বিষম সমস্যা।

বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তার সমাজের একটি প্রধান উন্নতির চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির ফল যদি হিতে বিপরীত হয়—যদি এরূপ হয় যে, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যথেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইতেছে; কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে মনের ঐক্য নাই—ধর্ম্মের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন; তবে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, যাহা বিদ্যা-বুদ্ধি বলিয়া গৃহীত হইতেছে তাহা প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি নহে। তবে কি আমরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া পুরাতন কুসংস্কারকেই সার করিব? তাহাই বা কিরূপে করি। যে ব্যক্তি বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছে—সে আর তাহার চরম পর্য্যন্ত না গিয়া কোন ক্রমেই ফিরিতে পারে না; যত কিছু বিভীষিকা সমস্তই মাঝের পথে—একটু বেশী অগ্রসর হইলে আর কোন ভয় নাই। যাঁহারা ঘোরতর স্থিতিশীল তাঁহারা বলেন "দূর কর তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি—ফিরিয়া যাও!" যাঁহারা ঘোরতর গতিশীল তাঁহারা বলেন "পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া দেখিও না সম্মুখে অগ্রসর হও।" স্থিতি-শীলও যেমন—গতিশীলও তেমনি; এ বলে আমায় দ্যাখ্—ও-বলে আমায় দ্যাখ্! স্থিতি-শীল ভবিষ্যৎ বাদ দিয়া অতীতে প্রবিষ্ট হন, গতিশীল অতীত বাদ দিয়া ভবিষ্যতে ধাবমান হ'ন; ইহাতে স্থিতিশীল জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যা'ন—গতি-শীল ক্রমাগতই হোঁচট্ খাইতে থাকেন। সমাজের এই এক বিষম সমস্যা। এখন উপায় কি?

উপায় আর কিছুই নয়—প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি; এক কথায় ধর্ম্ম-বুদ্ধি। নীরস বিদ্যা-

বুদ্ধি নহে কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ণ—সৌজন্য-পূর্ণ—সরস বিদ্যা-বুদ্ধি। আশ্চর্য্য এই যে, যে-সকল গতিশীলেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি-দিগের অত্যাচারের প্রতি খড়্গ-হস্ত তাঁহাদের মনের ভিতরে যদি তলাইয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অত্যাচার নিবারণ করা নহে কিন্তু অত্যাচার করা। এখনকার কোন শূদ্র যদি ইংরাজি পুঁথিকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় জানিও যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার-নিবারণ তাহার উদ্দেশ্য নহে—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণেরা কবে কোন্ জন্মে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল—এখন তাহার নাম-গন্ধও নাই,—এখন-কার রাজ-নিয়মের সমক্ষেই যে, কেবল ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমান তাহা নহে; ব্রাহ্মণেরা আপনারাই শুদ্ধাচার ও শাস্ত্র-চর্চার প্রভাবে অনেক দিন হইতে বিশিষ্টরূপে সাত্ত্বিক ভাবের আধার হইয়া আসিতেছেন—তাঁহারা বিশিষ্ট-রূপে বুদ্ধি-জীবী ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক; তাহা বলিয়া কি দাম্ভিক কুলীন ব্রাহ্মণ নাই? আছে—কিন্তু কে তাহাদিগকে ভাল বলে? শূদ্রের মধ্যেও এমন অনেক দাম্ভিক ব্যক্তি আছে যাহাদের মাটিতে পা পড়ে না; এ সকল অকাল-কুষ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দেও। এখনকার শূদ্র অনত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কখনও কখনও যে, অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহার অর্থ আর কিছু নয়—“আমরা ব্রাহ্মণের দাস হইব কেন—ব্রাহ্মণেরা আমাদের দাস হইবে;” এই রূপ আর একটি কথা এই যে, “স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন—স্বামী স্ত্রীকে পূজা করিবে;”—ইহাতে দোষের সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক্—দোষের কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয় এই মাত্র; পূর্ব্বে নয় পতি ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল—এখন নয় স্ত্রী ও শূদ্রের আধিপত্য হইল; ইহাতে মন্দ বই ভাল কি হইল—তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না। ফরাসীস্ বিদ্রোহের সময় সাধারণ লোকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া লাভের মধ্যে আপনারা শত সহস্র গুণ অত্যাচারী হইয়া সমাজকে ছার খার করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীরা যদি ধর্ম্ম-ভাবে চালিত হইত তাহা হইলে উপরের লোকদিগের অত্যাচার নিবারণ পর্য্যন্তই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইত, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য আর-একরূপ; তাহাদের মনের কথা এই যে, “উহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিবে কেন—আমরা উহাদের উপর অত্যাচার করিব;” অত্যাচার-মাত্রই যে, অন্যায়, এ জ্ঞান তাহাদের নাই; তাহাদের জ্ঞানের দৌড় কেবল এই পর্য্যন্ত যে, “অন্যেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলেই তাহা অন্যায়—আমরা অন্যের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহা খুবই ন্যায্য।” এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক যাহারা “অধিকাংশ” বলিয়া পরিগণিত হয় ও যাহাদের মত না লইয়া কোন কার্য্য হয় না—তাহারা কুচক্রী সিন্নার (Cinna) অপরাধে সচ্ছন্দে কবি সিন্নাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। আসল কথা এই যে, যাঁহারা অনেক কাল হইতে সমাজের শিরঃ-স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই বিদ্যা-বুদ্ধি এবং রসজ্ঞতায় সমাজের নিম্ন-শ্রেণী অপেক্ষা উন্নত, আর নিম্ন-শ্রেণীরা বিদ্যা-বুদ্ধি এবং আত্ম-সংযমে যে, কত হীন, তাহা উপরে দেখা গেল। এরূপ অবস্থায়, নিম্ন-শ্রেণীরা যে, উচ্চ শ্রেণী-দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কোন উন্নতি লাভ করিবে তাহা হইতেই পারে

না। সারথী অশ্বকে পীড়ন করিলে, অশ্ব ক্ষেপিয়া উঠিয়া সারথীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া অশ্ব কখনই সারথী হইতে পারে না। অধিকাংশের মত কেবল একটা কথার কথা মাত্র, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত শত কোটি যে-সে ব্যক্তির মত অপেক্ষা শত গুণে মুল্যবান্। অতএব সমাজের যত কিছু উন্নতি সমস্তই উচ্চ-শ্রেণীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে। উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ কুলে শীলে বিদ্যাতে বুদ্ধিতে যাঁহারা উচ্চ।

যাঁহারা সমাজের শিরস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই স্থিতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সমাজে যখন স্থিতি-শীলতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয় তখন কাষ্ঠ-হাসি,কাষ্ঠ-কান্না কাষ্ঠ-লৌকিকতা, কাষ্ঠ-সভ্যতা, এমন কি কাষ্ঠ-ধর্ম্ম এই সকলের প্রাদুর্ভাবে সমাজ নিতান্তই কাষ্ঠ বনিয়া যায়। এরূপ সমাজের স্বপক্ষে এক যা বলিবার আছে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, অসভ্যতা অপেক্ষা কাষ্ঠ সভ্যতা ভাল—অধর্ম্ম অপেক্ষা কাষ্ঠ ধর্ম্ম ভাল—ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ কথায় কাহারো মন ভুলিতে পারে না। অতএব সমাজের স্থিতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা স্থিতি-শীলদিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য। তেমনি আবার, যাঁহারা সমাজের পদস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই গতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে সুযোগ পা'ন। সমাজে গতি-শীলতার আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি হইলে সমাজ একেবারেই আগুণ মূর্ত্তি ধারণ করে; কিন্তু সে আগুণ খড়ের আগুণ—দেখিতে দেখিতে ধুমে পরিণত হইয়া যায়। অতএব গতি-শীলদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সমাজের স্থিতির কোন প্রকার ব্যাঘাত না করিয়া সাবধানে গম্য পথে অগ্রসর হ'ন।

ভাঙন এবং গড়ন এ দুয়ের সন্ধিস্থলে পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয়। সেই সকল মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সমাজের গঠন কার্য্যের মূল প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার পরে যাঁহারা আইসেন তাঁহারা উঁহাদেরই প্রদর্শিত পথের অনুগামী হ'ন,—ইঁহাদের বীজ মন্ত্র এই যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা;" ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতি-শীল; পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্যক্তিরা সৃষ্টি-শীল নামেরই যোগ্য। যাঁহারা সৃষ্টি-শীল তাঁহারা ভাঙন এবং গড়ন দুয়েরই মর্ম্মজ্ঞ। সৃষ্টি-শীল ব্যক্তি ধর্ম্মবুদ্ধিকে—শ্রদ্ধাভক্তি-পূর্ণ সরল শুভবুদ্ধিকে—সহায় করিয়া এমন একটি মধ্য-ভূমিতে দণ্ডায়মান হ'ন—যেখানে বিবাদ-বিসম্বাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদকে প্রেমাগ্নিতে গালাইয়া নূতন এক উপাদানে পরিণত করেন। তিনি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের পদানত করিতে যা'ননা—শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের পদানত করিতে যা'ন না,—পরন্তু ব্রাহ্মণ যাহাতে সদ্‌ব্রাহ্মণ হয় ও শূদ্র যাহাতে সৎশূদ্র হয়—তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ সৎ হইলে স্বভাবতই সদ্‌ব্রাহ্মণ হয়—শূদ্র সৎ হইলে স্বভাবতই সৎশূদ্র হয়; পতি সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপতি হয়, পত্নী সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপত্নী হয়। এইরূপ যখন ব্রাহ্মণ শূদ্র—পতী পত্নী—ধনী দরিদ্র—সবল দুর্ব্বল—সমস্তের মধ্য হইতে সদ্ভাব উদ্গীরিত হইয়া উঠে—যখন দ্বন্দ বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সমাজ নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে পদ-নিক্ষেপ করে। এরূপ ঘটনা যখন তখন ঘটিতে পারে না—ইহা সময়ের পরিপক্কতাকে

অপেক্ষা করে। এখনকার কালে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদেরই প্রাদুর্ভাব—ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালাই এখনকার কালের ধর্ম্ম ; ইহার কুফল সমাজে যতই দেখা দিবে ততই লোকের চক্ষু ফুটিবে—ক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে ধর্ম্ম-সূর্য্য মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া অমায়িক শোভন মূর্ত্তিতে লোকসমাজে অভ্যুদিত হইবে।

ঈশ্বর লাভ।

ঈশ্বর যেমন জড়জগতের রাজা, আধ্যাত্মিক জগতের তেমনই তিনি একমাত্র অধীশ্বর। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহ্যজগত একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর শৈশবাস্থায় যে নিয়ম কার্য্যকরী ছিল, এখনও তাহার সত্ত্বা বর্ত্তমান। এখানকার কোন বস্তুই সেই অক্ষর পুরুষের শাসন অতিক্রম করিয়া চলিতেছে না। তিনি একবার ইহাকে যে সুন্দর নিয়মের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া স্বয়ং সাক্ষী স্বরূপে তাহা অবলোকন করিতেছেন, যতদিন না তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইবে ততদিন একই ভাবে চলিতে থাকিবে, কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সমন্বিত এই সুবিশাল ভূমণ্ডল ইহার প্রত্যেক পদার্থ রহস্যে বিজড়িত হইয়াও আমারদের বিস্ময়ের উদ্দীপন করিতে পারে না, স্রষ্টার অনুপম কৌশল স্মরণ করিয়া দেয় না, ইহার একমাত্র কারণ জড়জগতের নিয়ম সকলের সমতা। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যে সূর্য্য পৃথিবীর অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়াছিল, যৌবনে সেই কালে সেই স্থানে তাহার প্রকাশ দেখিতেছি, বার্দ্ধক্যে আবার তাহাই দেখিব। পূর্ব্বে তমিস্রা ও চন্দ্রালোকের পর্য্যায়ক্রমে যে উদয়াস্ত দেখিয়াছি, কখনই আর তাহার বৈষম্য দেখিতে হইবে না। ঐ প্রকৃতির সাম্যভাব সেই জন্যই অপেক্ষাকৃত স্থূলদর্শীদিগের চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণে যখন আবার ঝঞ্ঝাতরঙ্গের অভ্যুদয়ে পৃথিবীর মুখচ্ছবি বিকৃত হইয়া যায়, অগ্ন্যুৎপাত বা জলপ্লাবনের ঘোর উৎপাতে গ্রাম ও নগরের বিলয়দশা উপস্থিত হয়, গ্রহণ বা ধূমকেতুর প্রকাশে ধরাপৃষ্ঠে নূতন দৃশ্য সংঘটিত হয়, তখনই মনুষ্যের অন্তরে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। সমতল দেশবাসী মনুষ্যকে হিমালয়ের মহান দৃশ্য দর্শন করাও, সাগরের গম্ভীর নির্ঘোষী তরঙ্গ নিচয়ের মধ্যে অর্ণবযানযোগে লইয়া চল, দেখিবে তাহার হৃদয়ের জড়তা অপসারিত হইয়া গিয়া কার্য্যকারণ পরম্পরার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে! পৃথিবীর উপরে নিমেষে নিমেষে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অনবরত ঘটিতেছে, তাহার এক একটিই মনুষ্যের লৌহ কবাটাচ্ছন্ন হৃদয়কে সজীব করিয়া তুলিতে পারে, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া দিতে পারে,। কেবল মনুষ্য সস্পৃহ ভাবে দেখে না, শুনে না সেই জন্যই সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারে না। মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের যতটুকু সম্পর্ক, তাহা হইতে মনুষ্যের মন যে সহজে কার্য্য হইতে কারণের দিকে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল আপনার দোষে। তিনি ত সমুদয় জগতকে ইহার অনুকূল করিয়া দিয়াছেন, কেমন জড়তা আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে দেয় না। তিনি ত প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্তে, পক্ষমাস ঋতু সম্বৎসরের আবর্ত্তনে কত রহস্য দেখাইতেছেন, আমরা মূঢ়জীব, একভাব একই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ের সস্পৃহ ভাবকে নির্ব্বান

করিয়া ফেলিয়াছি, এইজন্য তিনি ধরা দিলে আপনার মোহে তাঁহাকে ধরিতে পারি না। তিনিত স্বয়ংপ্রকাশ, তথাপি আমরা তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি, শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য জগতের যতটুকু যোগ, তাহা হইতে সহজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপস্থিত হইবার একটু গোলযোগ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল উপাদান বুদ্ধির সমক্ষে আনয়ন করে ও বুদ্ধি যাহা কিছু নৈসর্গিক ক্ষমতা প্রভাবে উহাদিগকে রোমন্থন করে, তাহার মূলে কার্য্যকারণের স্বাভাবিকত্ব অন্যতম। আজকাল ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানগরিমাপূর্ণ আস্ফালনের মধ্যেও সহজজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই বিশিষ্টরূপে সন্দিহান হইতে পারেন নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, কার্য্য কারণের অস্তিত্ব এইরূপ কয়েকটি সর্ব্বজনস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান দর্শনের সুপ্রকাণ্ড অট্টালিকা বিনির্ম্মিত রহিয়াছে। কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ আছে, এ বিষয়ে আর কার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই একটী সামান্য মুল সত্যের উপর দুর্গম বিজ্ঞান শাস্ত্রের অর্দ্ধেক বা ততোধিক তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। বুদ্ধি যতই আলোচনা করিতে থাকে, সৃষ্টি কৌশলের সূক্ষ্মতত্ত্ব যতই অন্বেষণ করিতে থাকে, আপনাকে ও আপনার নিয়তি যতই তাহার আন্দোলনের বিষয় হয় ততই সে ঈশ্বর হইতে আর দূরে থাকিতে পারে না। সে তাঁহার অস্তিত্বে সকল রহস্যের বিশদ মীমাংসা দেখিতে পায়। সকল কূট প্রশ্নের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে থাকে। সে তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে যে তাঁহাকে ছাড়িলে পৃথিবী লক্ষ্যশূন্য, অর্থশূন্য, ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা।

জ্ঞানের মীমাংসা পরিমিত হইতে পরিমিত পদার্থে (যেমন "মনুষ্য মাত্রেই মরণশীল, শ্যাম মনুস্য অতএব শ্যাম মরণশীল")। দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে অবশ্যই দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু যখন পরিমিত হইতে অনন্তের তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে তখন আর দর্শন শাস্ত্র কি করিবে? দর্শন শাস্ত্রের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার কি সাধ্য সে তাহাকে অনন্তের সমীপস্থ করে। বরং দর্শন শাস্ত্রের উপর অযথা নির্ভর করিলে, বুদ্ধির বিকৃতি উপস্থিত হয়। দর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্র এইই প্রতিপন্ন করে যে সেই অমৃতময় অনন্তদেবের রাগও আছে, দ্বেষ ও আছে, পক্ষপাতিতা আছে, তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয়, তাঁহার সঙ্গে একেবারে সাক্ষাৎকার লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে যারপর নাই অসম্ভব। এইরূপে যখনই মনুষ্য আপনার বুদ্ধির উপর অন্যায্য নির্ভর স্থাপন করিতে যায়, তখনই আপনার চক্রে আপনি পতিত হইয়া শোচনীয় অবস্থায়, নিরাশার কূপে এককালে নিমজ্জিত হয়। উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না।

এইরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শরীর বা ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি ইহারদের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের পথের সুপটু নিয়ামক নহে। ইহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকে। প্রত্যুত তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতে পারে না।

তাঁহাকে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণকে রিপুকুলকে সুশাসিত করিতে হইবে, মন হইতে পাপচিন্তাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। রাগাদি বিষয় ব্যাপার হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলে, তবে

আত্মার জ্যোতি প্রবল হইবে। সেই নিষ্কলঙ্ক পরিশুদ্ধ পবিত্র আত্মাই পরমাত্মার উন্নততম রত্নবেদী। সেই আত্মাতে পবিত্র পরমেশ্বরের মুখজ্যোতি যেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এমন আর কিছুতে নহে। বাহ্যজগত যেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বিষয়জ্ঞান যেমন বুদ্ধির বিষয়, ঈশ্বর তেমনি আত্মার বিষয়। আত্মাদ্বারা তিনি যেমন সুপষ্ট রূপে গ্রাহ্য হয়েন এমন আর কিছুতে নহে। বিষয় ব্যাপারে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও মন উন্মত্ত,এমন একটু অবসর নাই যে আত্মা ঈশ্বরচিন্তা করিয়া বল লাভ করে, সেই জন্যই মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতি উদাসীন। শরীরের স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যায়াম আবশ্যক, বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্য যেমন চিন্তা ও অধ্যয়ন আবশ্যক, আত্মার জীবন রক্ষা ও উন্নতি লাভের জন্য তেমনই ঈশ্বরের আবশ্যক। ঈশ্বর আত্মার প্রাণ। সূর্য্যের আলোকের অভাবে যেমন ওষধি বনষ্পতি হীনবীর্য্য হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ সেই প্রেমসূর্য্যের অভাবে আধ্যাত্মিক বল একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

অসভ্যাবস্থায় বহির্জগতই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যই তাহার সকল তৃপ্তির স্থল। সে অবস্থায় মানসিক বা ঐশ্বরিক চিন্তার সময় তাহার নিকট অতিশয় অল্প। আপনার উদারান্ন সংগ্রহই তাহার একমাত্র উপজীবিকা ও জীবনের লক্ষ্য। ক্রমে যখন জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ উপায় অবলম্বিত হয়, যখন কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে তখন হইতেই মনুষ্য চিন্তাপ্রবণ হইতে থাকেন। কিন্তু সে চিন্তা আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যলাভের চিন্তা। সে চিন্তা আপনাকে লইয়া, বিষয় ব্যাপারের উপরিতন স্তরে উঠিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে ক্রমে যখন ইন্দ্রিয়ের উপর বুদ্ধির আধিপত্য স্থাপিত হয়, তখন হইতেই নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে মনুষ্য নিস্পৃহ হইতে থাকে। ক্রমে বিজ্ঞান সাহিত্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ হইতে থাকে।

কিন্তু এ অবস্থাও মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা নহে। উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভের এখনও বিলম্ব রহিয়াছে। জীবনের অনিত্যতা, কৃষি বিজ্ঞানের অনিত্যতা, ধনজন পরিজনের অস্থিরতা ক্রমে তাহার আত্মার ভাবকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে থাকে। তখন মনুষ্য বুঝিতে থাকে যে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভই মনুষ্যের সকল লাভের চরমসীমা। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের আর অন্য কোন অভাব থাকে না।

ঈশ্বর আমারদের আত্মার অন্তরাত্মা। মানবাত্মা তাঁহারই সাদৃশ্যে গঠিত। ঈশ্বরবিষয়ক আস্তিক বুদ্ধি তাঁহার অনুপম পিতৃভাব অসদৃশ মাতৃস্নেহ, আত্মাই বিশদরূপে অনুভব করিতে পারে। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া" এই মতি তর্ক দ্বারা প্রাপনীয় নহে। তিনি আমারদের প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতা প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন। কৃপণের ধনের ন্যায় তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। তিনি সাধনের ধন। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তবে আত্মার বলে সাধনার বলে তাঁহার আত্মস্বরূপ আমারদের নিকট প্রতিভাত হয়।

মনুষ্যবিশেষের ন্যায় মনুষ্য সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও পরিণতির অবস্থা আছে। মনুষ্য সমাজের ন্যায় মনুষ্য—যখন বাল্যাবস্থায় প্রবিষ্ট হয়, তখন আহার বিহার লইয়াই সে নিকৃষ্ট সুখ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত থাকে। তখন চিন্তা বা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সে কিছুই অবগত নহে। ক্রমে যখন

যৌবন উপস্থিত হয় জনসমাজে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়, মনুষ্যও উহার চর্চ্চায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। প্রভূত বলবিক্রম লাভ করিয়া বীরবিক্রমে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতে থাকে। সংসারের অনিত্যতা, সাংসারিক সুখের অস্থিরতা বুঝিতে পারে না। ক্রমে সাধন তপস্যায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়। এ অবস্থা মনুষ্য বা সমাজের পরিণতির অবস্থা। যৌবনে যে কিছু সত্য সঞ্চয় করে, যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করে, যৌবন-সুলভ চপলতার অপগমে মনুষ্য তাহা ভোগ করিতে থাকে। যে অক্ষয় ধনে ধনী হইতে পারিলে নির্ভয় হওয়া যায়, মনুষ্য তাহারই অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হয়। আত্মা এই অবসরে নিজ কন্দরে ঈশ্বরের সংমোহন মূর্ত্তি প্রতিফলিত করে। মনুষ্য তাহা দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সংসারের দিকে আর দীপ্তশিরা হইয়া ধাবিত হয় না। বলিতে থাকে "সংসারের সুখ যাহা জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে"। এই অবস্থা জনসমাজের বা মনুষ্যের পক্ষে পরম সম্পদের অবস্থা। এই অবস্থায় উঠিতে পারিলে আর স্খলিতপদ হইতে হয় না। তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সংসার-মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইবার পূর্ব্বে অক্ষয় ব্রহ্মপদ দেখিতে পান। যিনি শরীর মন আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও আত্মার অনন্ত ক্ষেত্র ও অনন্ত অধিকার ক্ষণমাত্র বিস্মৃত নহেন।

ব্রহ্মসাধন অতি কঠোর সাধন, শরীর মন আত্মা নিয়োজিত কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা তাঁহার দ্বারের একমাত্র কুঞ্চিকা। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, মনেরও গ্রাহ্য নহেন। তিনি কেবল আত্মারই গ্রাহ্য। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"। তিনি বাক্য, মন ও চক্ষুর গোচর নহেন। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজে অশান্তি।

(এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের লেখার উপর আর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের মন্তব্য প্রকাশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম মহাশয় লিখিয়াছেন যে আধ্যাত্মিকতার অভাবই ব্রাহ্মসমাজের অশান্তির কারণ। ইহা অতি যথার্থ কথা কিন্তু আমাদিগের মতে সকল আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে ঔদার্য্য গুণের অভাবই এই অশান্তির বিশেষ কারণ। আমাদিগের কাহারও সঙ্গে একটু মত বিভেদ হইলেই আমাদিগের মনে তাহার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষের উদয় হয় কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আসল বিষয়ে যদি আমাদিগের মতের ঐক্য থাকে তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের অনৈক্যে কি আইসে যায়? শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গত সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তিনি ব্রাহ্মদিগকে যে অমূল্য উপদেশ দেন তাহাতে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধান করা কর্ত্তব্য। "তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল—বেদবচনে তোমাদিগের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ ও হিত কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য যদি তোমরা এই পদ্ধতিটি অবলম্বন কর তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই আমরা আদি ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ

ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদিগের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করি। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদিগের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।" বাঙ্গালীর দোষ-দর্শনবৃত্তি প্রবল। এই প্রবলতা হেতু এই জাতি উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক ঐক্য আছে। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দেশের লোকের দোষ-দর্শন-বৃত্তি এত প্রবল নহে। বঙ্গদেশে এই দোষ দর্শন বৃত্তির প্রবলতা রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন অনৈক্য ও বিবাদের হেতু তেমনি ধর্ম্ম বিষয়েও অনৈক্য ও বিবাদের হেতু। মনুষ্যের দোষের ভাগ অপেক্ষা গুণের ভাগ দেখা কর্ত্তব্য। এই দোষ দর্শন প্রবৃত্তির প্রবলতার কারণ ঔদার্য্যের অভাব। ব্রাহ্মসমাজে অশান্তির আর এক কারণ প্রাধান্যের ইচ্ছা। ব্রাহ্মসমাজের লোক মুষ্টিমেয় লোক। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে বিরোধ কলহের প্রবলতা দেখিয়া বাহিরের লোকে অবাক্ হয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সকলেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রাধান্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, যে প্রাধান্য চায় সে প্রাধান্য পায় না; যে প্রাধান্য চায় না সে প্রাধান্য পায়। যাহাকে ঈশ্বর প্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সে প্রধান হইতে চেষ্টাবান হউক বা না হউক সে প্রধান হইবেই। আর সকলই যদি প্রধান হইবেক তবে নিকৃষ্ট হইবেক কে? ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই এক একটি নূতন মত, একটি একটি নূতন দল, স্থাপন করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা। ইহাতে কেবল বিরোধ কলহই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদিগের সমাজের মহা বাক্য বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য। আসল বিষয় ঐক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অনৈক্য অতএব নূতন দল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নূতন দল স্থাপনের একমাত্র মূল প্রাধান্যের ইচ্ছা এবং নম্রতা ও ঔদার্য্যের অভাব। কোন মহাত্মা ঔদার্য্যের গুণ যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম আমরা দিতেছি। "যদ্যপি দেবতার ন্যায় আমার বক্তৃতা-শক্তি থাকে, যদ্যপি আমার ভবিষৎ বিষয়ে দিব্য জ্ঞান থাকে, যদ্যপি গুপ্ত অগুপ্ত সকল বিদ্যা আমার আয়ত্ত থাকে, যদ্যপি ঈশ্বরে আমার খুব বিশ্বাস থাকে, যদ্যপি আমি আমার সর্ব্বস্ব দরিদ্রকে দিই কিন্তু যদি আমার ঔদার্য্য গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহাতে কোন উপকারই হইবে না। ঔদার্য্য অনেক সহ্য করে, ঔদার্য্য সদাই সদয়। ঔদার্য্য ঈর্ষা করে না, ঔদার্য্য গর্ব্ব করে না, ঔদার্য্য স্ফীত হয় না, ঔদার্য্য অভদ্র ব্যবহার করে না। ঔদার্য্য স্বার্থ খুজে না, ঔদার্য্য শীঘ্র রুষ্ট হয় না, ঔদার্য্য কু ভাবে না। ঔদার্য্য সকল বহন করে, সকল বিশ্বাস করে, সকল আশা করে, সকল সহ্য করে। ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না। ভবিষৎ দৃষ্টি অসিদ্ধ হয়, বক্তৃতাশক্তি অসিদ্ধ হয়, বিদ্যা অসিদ্ধ হয়। কিন্তু ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না।" এই ঔদার্য্য গুণ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজের এক নূতন শ্রী হইবে।

কোন ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক কাশীর দণ্ডী ও পরমহংসদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাঁহাদিগের মনের শান্তি অত্যন্ত ও তাঁহাদিগের চিত্ত সদাই আত্মপ্রসন্নতা দ্বারা

জ্যোতিষ্মান। "great tranquility of mind and radiant happiness of temper" কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত দেখা যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সদাই চঞ্চল, সদাই আবেগপূর্ণ, সদাই অসন্তুষ্ট, সদাই দোষানুসন্ধানে তৎপর। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে 'সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় সমান্বিতায় প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যাং।' সম্যক প্রশান্তচিত্ত ও সমান্বিত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। আমরা তাঁহাদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া কি এই শান্তি ভোগ করিতেছি? ইহা গভীর আলোচনার বিষয়।

শান্তিনিকেতন।

মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে স্থলে অনেকানেক স্থানের ভগবদ্ভক্ত সাধুলোক সকল আসিয়া আশ্রয় লন তাহাই তীর্থ এবং তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণেই তৎতৎ স্থান পবিত্র স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলত তীর্থস্থান থাকাতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপকার সাধিত হয়। সংসারের অনেক পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা। কিছুদিনের জন্য ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করিলে মনের নির্বৃতিলাভ হয় এবং সংসার তাপ অনেকটা ঘুচিয়া যায়। এই সাধু উদ্দেশে আজও অনেকে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধুসঙ্গে ও সৎ প্রসঙ্গে নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত ব্রাহ্ম সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের জন্য ঐ রূপ একটী পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ শান্তিনিকেতন। তিনি ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ ঐস্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রহ্মসন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ঐ স্থানে যাইবেন। উহা ব্রহ্মবিৎ সাধু লোকের আশ্রয়-ভূমি হইয়া রহিল। যাঁহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা ঐ শান্তিনিকেতনে যাত্রা করুন। উহা সাধু সমাগমে সততই পবিত্র। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারিবেন। ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে একটী সাধু সজ্জনের মেলা হইবে। দেশ দেশান্তরের জ্ঞানী ও সাধুর সমাগম হইবে। যিনি সংশয়ী ধর্ম্মবাদ তাঁহার সংশয় দূর করিবে। যিনি আরুরুক্ষু তিনি ধর্ম্মের সোপান পাইবেন। যিনি প্রেমিক তিনি হৃদয়োন্মাদকর অনেক সৎকথা শুনিবেন। যিনি সজ্জনভক্ত তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে। এই স্থানের যেমন পবিত্রতা তেমনি রমণীয়তা। ইহার চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তর। স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ু সততই বহিতেছে। মধ্যে উদ্যান ভূমি ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তথায় ছায়াবৃক্ষ ও নির্ম্মল জলের অভাব নাই। কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুমধুর সঙ্গীতের বিরাম নাই। এই নির্জন স্থান শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সাধনস্থান ছিল। তিনি অনেক সময় ঐ স্থানে কালাতিপাত করিতেন। ফলত তাঁহার অধিষ্ঠানে ঐ স্থান পবিত্র। যিনি যতই মনোবিকার লইয়া যান স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার মনে নির্ম্মল ও পবিত্র শান্তি আসিবে। ব্রাহ্মসমাজের অদ্বিতীয় ও চির বন্ধু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ এই পবিত্র স্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কার্য্য তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে ইহাও তন্মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য। এখন ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি যে সৎ

উদ্দেশ্যে ইহা দান করিলেন তাহা যেন সুসিদ্ধ হয়।

আমরা নিম্নে ইহার ট্রষ্টডীড মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিলে ইহার কত উচ্চ ও সৎ উদ্দেশ্য তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ট্রষ্টডীড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্কষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

স্নেহাপদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্কষ্ট্রীট্।

কস্য ট্রষ্ট ডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রীক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিবিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতালা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটী আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মুল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের স্বর্ত্তমত স্থলাভিষিক্ত গণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্টডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ বিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত

কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিস ভোজন বা মদ্য পান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্ম-বিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোন রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ-নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্ন সহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তি-নিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐ রূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগনের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখন এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলন জন্য দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলিবন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্র-

মের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই-ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোন রূপ নিরাপদ মালিকি সত্ত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোন রূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী-সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই-ডিডের সর্ত্ত মত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্য সমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোন রূপ দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোন রূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ি হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশত ঐ কুঠীর দ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মুল্যের টাকা দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মুল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের স্বর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিত না। যে শাস্ত্র তুমি আমি এইরূপ ভেদজ্ঞান শিক্ষা দেয় প্রহ্লাদের বুদ্ধিতে তাহা অসৎশাস্ত্র। এই জন্য তাহাতে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না।

একদা দৈত্যপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস তুমি কি ভাল বুঝিয়াছ তাহা আমাকে বল।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ তুমি আমি এইরূপ মিথ্যা বা ভ্রমজ্ঞান বশত যাহাদের বুদ্ধি চঞ্চল হইয়াছে তাহাদের এই অধঃপাতের একমাত্র হেতু অন্ধকূপতুল্য গৃহ এককালে পরিত্যাগ ও হরির পদাশ্রয়কে আমি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি।

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন পরবুদ্ধিতেই বালকের এইরূপ মতিচ্ছন্ন হইতে পারে। যা হোক এখন ইহাকে গুরু গৃহে লইয়া যাও। আর যাহাতে হরিভক্তেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহার এইরূপ বুদ্ধিমোহ না জন্মাইতে পারে সে বিষয়ে সাবধান হও।

অনন্তর প্রহ্লাদের শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া স্নেহ বাক্যে কহিলেন বৎস প্রহ্লাদ তুমি সত্য বল, তোমার এই

রূপ বুদ্ধিমোহ কেন উপস্থিত হইল। ইহা তোমার পরকৃত, না আপনা হইতেই জন্মিয়াছে। তুমি স্পষ্ট করিয়া বল শুনিতে আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

প্রহ্লাদ কহিলেন দেখুন ব্রহ্মেরই মায়াবলে লোকের এইরূপ আত্মপর ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি অনুকূল হইলে এই জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এবং অভিন্ন আত্মায় নিষ্ঠা আইসে। যখন মুনি ঋষিরা যাঁর দূরবগাহ চরিত্রে বিমুগ্ধ হন তখন অবিবেকীরা সেই একমাত্র আত্মাকে স্বপর ভেদে দর্শন করিবে ইহাতে আর কথা কি। আপনারা আমার যে এই বুদ্ধিভেদের কথা জিজ্ঞাসিলেন, বলিতে কি, ইহা তাঁহারই প্রসাদে ঘটিয়াছে। যেমন লৌহ অয়স্কান্তের সান্নিধ্য পাইলে আপনা হইতেই ভ্রাম্যমান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্বতই আমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। জানি না ইহা আমার কোন্ পুণ্যের ফল।

প্রহ্লাদের এই কথায় রাজসেবক গুরু অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কহিলেন অরে, এই দৈত্যকুল চন্দন বৃক্ষের তুল্য, ইহাতে একটা কণ্টক বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে। হরি চন্দন বনের উন্মূলনের পরশু, এই বালকটা সেই অস্ত্রেরই মুষ্টিদেশ।

শিক্ষকেরা প্রহ্লাদকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া আবার দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল শিক্ষার পর একদা তাঁহারা দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্যরাজ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপবিষ্ট। প্রহ্লাদ প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন বৎস। এ যাবৎকাল তুমি গুরুগৃহে যাহা শিক্ষা করিয়াছ আমার নিকট তাহার পরিচয় দেও।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ যে শিক্ষায় ব্রহ্মের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পরিচর্য্যা পূজা বন্দনা দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি জন্মে আমি তাহাকেই সৎ শিক্ষা বলি।

দৈত্যপতি পুত্র প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শিক্ষকদিগকে কহিতে লাগিলেন রে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! তোমরা আমার বিদ্বেষের পাত্র হরির আশ্রয় লইয়াছ। এবং আমার অবমাননা করিয়া এই বালককে অসার বিষয় সকল শিক্ষা দিয়াছ। এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে তাহারা ছদ্মবেশী দুর্মিত্র। সুরাপায়ী প্রভৃতি মহাপাতকীদিগের যক্ষ্মাদি রোগ যেমন কালে প্রকাশ পায় সেইরূপ কালেই তাহাদের বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিক্ষক কহিলেন দৈত্যরাজ আপনার পুত্র যাহা কহিতেছেন ইহা আমার বা অপর কাহারও উপদেশে হয় নাই। এই বালকের ইহা নৈসর্গিকী বুদ্ধি। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমাদের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিবেন না।

তখন দৈত্যরাজ কহিলেন প্রহ্লাদ, যদি তোমার জ্ঞান গুরুমুখী না হয় তবে তুমি এই অসৎ ও অভদ্র জ্ঞান কোথা হইতে পাইলে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিত! সংসারেই যাহাদের সমস্ত সংকল্প বদ্ধ তাহাদের এই ব্রাহ্মী বুদ্ধি স্বত বা পরত কোন রূপেই উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ইন্দ্রিয় অসংযত সেই হেতু তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং কেবলই ভোগ্য ভোজ্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

ঈশ্বর অসীম।

চতুর্দ্দিকে আমাদের নানা বিষয় লালসা ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকের আঘাত তবুও আমরা এই সংসারে সুখে বর্দ্ধিত হইতেছি। তাহার কারণ শুধু তিনি। তাঁহার প্রাণে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুপ্রাণিত হইতেছি বলিয়া সেই মহাপ্রাণের ছায়ায় বসিয়া আমরা বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়দশা হইতে বার্দ্ধক্যে পতিত হইয়া ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহার বিরাম নাই। এই যে অগ্রসরের ভাব আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ইহার জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি, বিষয় আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, আমরা সেই মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতেছি। সেই লক্ষ্য কি আমাদের বিভীষিকা? সেই লক্ষ্য কি আমাদের সীমাবন্ধের ভয় দেখাইতেছে? না। যেমন কোন পথের উপর দাঁড়াইয়া যখন তাহার শেষ পর্য্যন্ত দেখি তখন স্বাভাবিক দৃষ্টির গতি অনুসারে মনে হয় বটে যে, পথ বুঝি ঐ স্থানে শেষ হইল আর নাই। কিন্তু পথের সেই সীমাবিন্দুতে যদি একবার গিয়া পঁহুছই তাহা হইলে তখন কি আমাদের যে সীমা মনে হইতেছিল তাহা থাকে? পথের আবার পূর্ব্বের মত সেই বিস্তার দেখিয়া আরও অগ্রসর হইবার ভাব জন্মে—হৃদয়ের আনন্দের প্রসারতা আরও বাড়িয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম আমাদের। সেই ব্রহ্মবিন্দুতে সকলি আসিয়া শেষ হইয়াছে। আমাদের নয়নের সমক্ষে তিনিই এক বিন্দু। সেই পরম বিন্দুকে কোন রূপ সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা ও তাহাতে আপ্তকাম হইবার মানস করা আত্মার উন্নতির মহান ব্যাঘাত। দূর হইতে যত তাঁহাকে আমরা দেখিব আমাদের দৃষ্টির অপূর্ণতা নিবন্ধন ততই তাঁহাকে সীমা আকারে দেখিতে পাইব। যতই কাছে যাইব—সীমা নাই এই বিশ্বাস ভরে যত কাছে যাইব ততই তাঁহার মাধুরী স্পষ্ট বোধগম্য হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন! তোমারেই প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের জীবন। তোমারই সহবাসে আমাদের আনন্দ। আমরা অদ্য তোমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পবিত্রতা প্রেরণ কর যাহাতে তোমার আনন্দ রূপ অমৃতরূপ দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি।

হিতেন্দ্র

নূতন পুস্তক।

সাহিত্য প্রসূন। শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। সংগ্রহকার বঙ্গীয় সাহিত্য ভণ্ডার হইতে কতিপয় রত্ন সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা এই সংগ্রহের বিশেষ আর কি পরিচয় দিব। যে সমস্ত লোক সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। ফলত ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষার একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দেয় মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত ও আমাদিগের অনর্থক ডাকমাশুল ব্যয় করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৩৮ সংখ্যা
১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার অমায়িক সহজ ভাব।

যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা তোমার নিকটতম বস্তু কে? তিনিই তাহার এই প্রত্যুত্তর দিবেন যে আমি আপনি। কেহই বলিবেন না যে আমি আপনা হইতে দূরে আছি; সকলেই বলিবেন যে আমার আপনার নিকট হইতে আমার লেশমাত্রও ব্যবধান নাই। অতএব যদি কোনও সত্য সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় তবে তাহা এই যে, আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু।

"আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু" ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সহজ বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা হইতে পারে না; বীজকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে ফলের প্রত্যাশায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সকল সত্যই পরস্পরের সহিত এরূপ অকাট্য সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত যে আমরা যদি একটি সামান্য সত্যকেও স্থিররূপে ধরিতে পারি তবে তাহার মধ্য দিয়া ক্রমশই উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। উপরি-উক্ত সহজ সত্যটির পথ-ধরিয়া চলিলে আমরা নিম্ন-লিখিত গুটিকতক অমূল্য আধ্যাত্মিক সত্যে সহজেই উপনীত হই।

প্রথমত, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু তাহাকে হারাণো দুষ্কর; দুষ্কর তো বরং পদে আছে—তাহাকে হারাণো একবারেই অসম্ভব। এই কাগচের দুইটী পৃষ্ঠা—দুইএর মধ্যে ব্যবধান অবশ্যই আছে, তথাপি মোটামুটি এরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে যে এই কাগচের এক পৃষ্ঠা তাহার আর এক পৃষ্ঠাকে হারাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের আপনার সঙ্গে আপনার সেটুকুও ব্যবধান নাই—মূলেই ব্যবধান নাই; কাজেই বলিতে হয় যে আপনাকে আপনি হারাণো একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে আত্মা কখনই আমাদের নিকট হইতে যাইবার বস্তু নহে—তাহা আমাদের চিরস্থায়ী পৈতৃক সম্পত্তি।

দ্বিতীয়ত, আত্মা যদি আমাদের এতই নিকটতম বস্তু—এমন কি তাহাকে হারাণো

পর্য্যন্ত অসম্ভব—তবে তাহার জন্য সাধনের প্রয়োজন কি? ইংলণ্ড হইতে আমি দূরে আছি এই জন্য ইংলণ্ডে যাইতে হইলে তাহার জন্য আমার সাধনের প্রয়োজন; কিন্তু আমি এখন কলিকাতায় রহিয়াছি, এ অবস্থায় কলিকাতা-প্রাপ্তির জন্য আমার সাধন আবার কিরূপ? তবে কি লোকে আত্মাকে লাভ করিবার জন্য এত যে কষ্টকর সাধনে প্রবৃত্ত হয়—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি? তাহা নহে। মনে কর যেন আমি বিদেশ হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেছি; একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি যে, সমস্ত দিক্ বিদিক্ ঘন কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন; নাবিককে কোথায় আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করাতে নাবিক বলিল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিন্তু আমি কলিকাতার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইতেছি না; এইরূপে আমি কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াও কলিকাতাকে হারাইয়া বসিয়া আছি। এ অবস্থায় যদি আমি কোনপ্রকার সাধনা দ্বারা কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করিতে পারি তবেই আমি কলিকাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই। সাধনের যে কি প্রয়োজন—এখন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আত্মাতে পৌঁছিবার জন্য নহে (আত্মার সহিত মুলেই যখন আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান নাই, তখন তাহাতে তো আমরা পূর্ব্ব হইতেই পৌঁছিয়া বসিয়া আছি), তবে কি—না মনের ভ্রম-প্রমাদ-মোহ রূপ কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করিবার জন্যই সাধনের একমাত্র প্রয়োজন।

এইখানে কেহ বলিতে পারেন যে মনের কুজ্‌ঝটিকা কি আত্মার কুজ্‌ঝটিকা নহে—মন কি আত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু? আমাদের দেশের শাস্ত্র-সমুহে অনেক কাল যাবৎ এ বিষয়ের চরম বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই; পরমার্থত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত কিন্তু ব্যবহারত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; ইহারই ভাষান্তর এই যে আত্মা রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত, মন রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; সঙ্ক্ষেপে পারমার্থিক আমিই আত্মা সাংসারিক আমিই মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মনই বা রোগ শোকাদির অধীন হয় কেন—আত্মাই বা তাহা না হয় কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে মন পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর বিষয়-সকলেতে প্রতিষ্ঠিত—বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহা রোগ শোকাদিতে আক্রান্ত হয়; আত্মা অনাদ্যনন্ত পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—অটল ভিত্তিমুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহাকে রোগ শোকাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনাই নাগাল পায় না; মেঘমালা পর্ব্বতের কটিদেশেই ঘুরিয়া বেড়ায়, শিখরকে কোন প্রকারেই স্পর্শ করিতে পারে না। এইখানে এইটীর প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি করা আবশ্যক যে, আমাদের আত্মা আমাদের আপনাদের সাধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদিগকে যদি আপনার চেষ্টায় নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নিয়মিত করিতে হইত—অন্ন পরিপাক করিতে হইত—শারীরিক উপাদান সকল নির্ম্মাণ করিতে হইত তাহা হইলে আমাদের শরীরকে এক মুহূর্ত্তও টেঁকিয়া থাকিতে হইত না; তেমনি যদি আমাদের আপনার চেষ্টায় আত্মার স্থিতি রক্ষা করিতে হইত তাহা হইলে আত্মা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। বরং প্রদী-

পকে ফাঁকা স্থানে বাঁচাইয়া রাখিলেও রাখা যাইতে পারে—আত্মাকে আপনার চেষ্টায় বাঁচাইয়া রাখা দেবতারও অসাধ্য। কিন্তু যখন আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তখন সে মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছে—সেখান হইতে কেহই তাহাকে অপহরণ করিতে পারে না ও সেখানে তাহাকে কোন বিপদই স্পর্শ করিতে পারে না।

সাধন তবে কিসের জন্য ? সত্য বটে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু; কিন্তু আমরা যখন আমাদের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের মন সর্ব্বদাই আমাদের আপনাদের নিকট-হইতে দূরে দূরে পরিভ্রমণ করে। বহির্ব্বস্তু যেমন ইতস্তত চালিত হয়—মনও সেইরূপ ইতস্তত চালিত হয়; কখনও বা প্রকৃতির অধীনে চালিত হয় কখনও বা আমাদের আপনাদের অধীনে চালিত হয়; এই মনকে বশীভূত করাই সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা বহির্বস্তু সকলকে আপন ইচ্ছায় ইতস্তত চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বহির্বস্তুসকলের মূলস্থানীয় প্রকৃতির উপরে আমাদের কোন হস্ত নাই। তেমনি আবার আমরা আমাদের মনকে আপন ইচ্ছানুসারে যথা তথা চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু মনের মূলস্থানীয় আত্মার উপরে আমাদের আপনাদের কোন হস্ত নাই। সমস্তের মূল স্থান একমাত্র কেবল পরব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সেখান হইতে তাহা তিলমাত্রও বিচলিত হইতে পারে না। আমরা বহু যত্নে বীজ আনয়ন করিলাম—ক্ষেত্রকর্ষণ করিলাম—বীজকে তাহার সেই সুখের শয্যায় নিহিত করিলাম; তাহার পর বীজ আমাদের নিকট কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার কার্য্য আপনি করিতে আরম্ভ করিল; কিছু দিন যাইতে না যাইতেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; তাহার আর কিছু দিন পরে শাখাপত্র ফল ফুলে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল; ইহাতে আমাদের হস্ত কতটুকু? শুদ্ধ কেবল বীজকে আনয়ন করা এবং ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা—এইমাত্র। মনকে সেই রূপ বহিঃপ্রদেশ হইতে প্রত্যানয়ন করা এবং আত্মাতে সমাহিত করা অবশ্যই আমাদের সাধন-সাপেক্ষ; কিন্তু তাহার পর ঈশ্বর-প্রসাদে মন আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লয়; আমাদের সাধনের কোন অপেক্ষা রাখে না। শ্রীমৎ ভগবৎগীতা বলিতেছেন—

“যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।”

অর্থাৎ চঞ্চল অস্থির মন যেখানে যেখানে ধাবিত হয় সেই সেই স্থান হইতেই তাহাকে বাগাইয়া আনিয়া আত্মাতে সংযত করিয়া রাখিবে। আরও বলিতেছেন—

“শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।”

অর্থাৎ ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা মনকে অল্পে অল্পে বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া কোন চিন্তাই করিবে না। এইরূপ মনকে প্রত্যানয়ন করা এবং তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করা ইহাই সাধনের মুখ্য কার্য্য। তাহার পর যাহা কিছু হইবার তাহা ঈশ্বর-প্রসাদে আপনা হইতেই হইবে,—তাহার জন্য আমাদের চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। তাই কথিত হইয়াছে “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ”। বীজকে যত্ন পূর্ব্বক বপন করা অবশ্য আমাদের সাধন-সাপেক্ষ,

তাহার পরে আর আমাদের চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তখন বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে পত্রপুষ্প-ফলোদ্গম, ইত্যাদি যাহা কিছু হইবার তাহা আপনা হইতেই হয়। আর এক কথা এই যে, আমাদের অভীষ্ট বিষয় যতক্ষণ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে ততক্ষণই তাহার জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তা শোভা পায়; কিন্তু যখন আমরা তাহাকে মুষ্টির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই তখন তাহার জন্য আমাদের ভাবনাই বা কি, আর, চিন্তাই বা কি। তখন চিন্তা আনন্দকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি অন্তর্ধান করে। তেমনি আমাদের মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায় ততক্ষণই আত্মার জন্য আমাদের যাহা কিছু ভাবনা চিন্তা; কিন্তু যখন আমাদের মন আত্মাতে রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসে—আত্মাকে যখন করতলে প্রাপ্ত হয়—তখন আর ভাবনা চিন্তার আবশ্যকতা থাকে না, তখন বিমল আনন্দ অভ্যুদিত হইয়া সমস্ত ভাবনা চিন্তা গ্রাস করিয়া ফেলে।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, মনের গতি-কে বিষয় রাজ্য হইতে আত্মার দিকে ফিরাইয়া আনাই সাধন। বহির্ব্বস্তুর গতি এবং মনের গতি এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গতিশীল্ বহির্ব্বস্তু হইতে বস্তুটিকে বাদ দিয়া শুদ্ধ যদি তাহার গতিটিকে গ্রহণ করা যায়, তবে সেইরূপ বস্তু-শূন্য গতিই মনের গতির একমাত্র উপমা-স্থল, কেননা মন যখন চলে তখন তাহার সে চলার সঙ্গে কোন বস্তু মিশ্রিত থাকে না। তাহার সেই গতি শূন্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু গতি বস্তুকে চায়—স্থিতিকে চায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিধান করিতে চায়; শূন্যে শূন্যে থাকিতে চায় না; এই জন্য মন আপনার গতি-কে বিষয় ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য—অবস্তুক গতি'কে সবস্তুক করিবার জন্য—লালায়িত হয়; মন স্বভাবতই আপনার গতি-কে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নৈসর্গিক ক্রিয়াতে এবং চলা-ফেরা, দেখা-শোনা, বলা-কহা, নৃত্য গীত, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াতে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু বিষয়-ক্ষেত্র পরিমিত, মনের গতি অপরিমিত; বিষয়-ক্ষেত্রে মনের গতি এক আনা মাত্র চরিতার্থ হয়—পোনেরো আনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং মন তাহাতে আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥”

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনা কখনই নিবৃত্ত হয় না—ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সাধক তাই বিষয়-ক্ষেত্র হইতে মনের গতি ফিরাইয়া আনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম এবং অন্তরতম আত্মাতে সমাহিত করেন—ইহাতে তাঁহার মন স্বস্থানে বসিয়াই সমস্ত কামনার বিষয় হাত বাড়াইয়া পায়; এইরূপ সাধকই “আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” ইনি আত্মাতে ক্রীড়া করেন, আত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশালী হয়েন—ইনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং এইরূপ সাধক উপলক্ষে ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন
কামকামী॥

অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে নদী আসিয়া বিলীন হয় তেমনি কামনা-সকল যাঁহাতে আসিয়া লয় প্রাপ্ত হয়—তিনিই শান্তি লাভ করেন, কামনার জন্য যিনি লালায়িত তিনি নহেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সাধক অনেক সাধ্য-সাধনা দ্বারা অবশেষে যে আধ্যাত্মিক আনন্দে উপনীত হ'ন—বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহা সাধন-নিরপেক্ষ; তাহা আত্মার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে—তাহা আত্মার পৈতৃক সম্পত্তি; পরমাত্মার প্রসাদ এবং করুণাই তাহার মূল; মোহাচ্ছন্ন মনের আবরণে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—সাধক সেই ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া ফেলিল, আর, আত্মার সুবিমল আনন্দ আপন মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে তাহাতে বিশ্বাস নাই; কেননা বিপরীত সাধন দ্বারা তাহার ধ্বংস হইলেও হইতে পারে। আমরা যদি অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা বৃহৎ উপলখণ্ডকে পর্ব্বতের উপর উত্তোলন করি, তবে তাহার বিপরীত সাধন দ্বারা অতীব সহজে তাহাকে আমরা পর্ব্বত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারি। কিন্তু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার হস্তে গচ্ছিত রহিয়াছে—সেখান হইতে তাহা কোন ক্রমেই বিচ্যুত হইবার নহে; তাহা বিষয়-মোহ দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে অপহরণ করে। মনের মোহাবরণ অপসারিত হইলেই আত্মার স্বকীয় পারমার্থিক ভাব—জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান—অমায়িক প্রেম ও অপর্য্যাপ্ত শান্তিসুধা—মনের উপর কার্য্য করিতে পথ পায়; তখন, আত্মারূপ স্পর্শমণি সংসারকে পারমার্থিক রাজ্য করিয়া তুলে—লৌহকে সুবর্ণ করিয়া তুলে। ঈশ্বরের মহিমা যেমন অনন্ত তাঁহার করুণা তেমনি অপার; যেমন তিনি—তেমনি তাঁহার দান—সকলই আশ্চর্য্য, কিন্তু তাঁহার অপরাজিত করুণার নিকটে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অতএব পাপরাশিতে ভারাক্রান্ত কলুষিত মন যে তাঁহার প্রসাদে পুনর্ব্বার নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল বদনে দীপ্তি পাইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাঁওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকি ময়লা ছূটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥"

আত্মার অন্তরতম আনন্দ যে আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহা যে কখনই আত্মা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না—তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞান দুইরূপ—বস্তু হইতে পৃথক থাকিয়া বস্তুকে জানা—এবং বস্তু হইয়া বস্তুকে জানা। বহির্বস্তুকে জানিবার সময় আমরা বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিয়া বস্তুকে জানি; আত্মাকে জানিবার সময় আমরা আত্মা হইয়া আত্মাকে জানি। যখন আমরা ঘটি বাটীকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্য আমাদের বাহিরে—জ্ঞান আমাদের অন্তরে—সত্য এবং জ্ঞান পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত; কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্যও আমাদের অন্তরে—জ্ঞানও আমাদের অন্তরে—দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও ব্যবধান নাই। আত্মা যখন আপনাতে আপনি গলিয়া একীভূত হইয়া আপনাকে জানে তখন তাহার সেরূপ জানাকে জ্ঞান বলিলেও বলা যায়—প্রেম বলিলেও বলা

যায়; বাস্তবিক তাহা জ্ঞান এবং প্রেম দুয়েরই পরাকাষ্ঠা। আত্মা আপনাকে আপনি চায়, অথচ তাহার আপনার সহিত আপনার ব্যবধান নাই; অভিলষিত বস্তুর সহিত ব্যবধান না থাকা কত না আনন্দের প্রস্রবণ। এইরূপে আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া আলোকে আবিষ্কৃত করা এবং কার্য্যে ফলিত করা—ইহাই সাধনের সার সংকল্প।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্মার সহজ আনন্দ বীজ-স্বরূপ; তাহার মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার প্রতি প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সকলেই দেখিয়াছেন—ছোলার বীজের দুই দল ভেদ করিয়া কেমন অল্পে অল্পে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে; সত্য এবং জ্ঞান সেইরূপ আত্মার দুইটি দল; তাহার মধ্য হইতে আনন্দ-রূপ অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া পরমাত্মার প্রতি প্রসারিত হয়। এইরূপে যখন বিজ্ঞান-ময় কোষ হইতে আনন্দ-ময় কোষ উন্মেষিত হইয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মার প্রসাদ-বারি এবং শান্তি-সুধা অবতীর্ণ হইয়া আত্মাতে নূতন জীবন সঞ্চার করে। এই যে একটি কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মার সহজ আনন্দ আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে না, ইহার অর্থই এই যে, তাহা জগতের মূলতম এবং অন্তরতম প্রদেশ হইতে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে—আসিতেছে; সাধক পরমাত্মার এই অপার করুণা দৃষ্টে এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন যে, তিনি তাঁহার ভক্ত সেবক এবং প্রেমিক না হইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। পরমাত্মাই আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা এবং চরম পর্য্যাপ্তি।

বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষের আগমন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অদ্যকার প্রাচীন সূর্য্য গভীর সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল—বর্ষবিম্ব অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইতে চলিল। সুখ দুঃখময় বর্ত্তমানের ঘটনাবলী চিরকালের জন্য স্মৃতির পুরাতন কক্ষে নিহিত হইল। পৃথিবীর গণনা ক্রমে আমরা জীবন পথে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরের দিকে—অমৃতের দিকে একপদ অগ্রসর হইতে চলিলাম। অদ্যকার রজনীর সঙ্গে সঙ্গে আমারদের জীবনের এক অঙ্কের পরিসমাপ্তি হইল। যাঁহার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া নানা ঝঞ্ঝাতরঙ্গের মধ্যেও তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া হৃদয়ের বলকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি, শোক-তাপে ভয় বিপদে প্রপীড়িত হইয়াও যাঁহার প্রসন্নমূর্ত্তি সন্দর্শনে ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইয়াছি, পাপের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়াও যাঁহার বজ্রনির্ঘোষী কঠোর আদেশ শ্রবণে কম্পিত কলেবরে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা করিয়াছি, আজ বৎসরের শেষ রজনীতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সকলে সমাগত হইয়াছি। আমরা ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিগন্ত বিশ্রান্ত অনন্তপথ, প্রাণবিহঙ্গ অনন্ত আকাশে উড্ডীন হইবার জন্য বর্ষকালের পর বর্ষকাল অতিক্রম করিয়া সেই মহারজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে। যেখানে দেশ কালের ব্যবধান নাই, পক্ষমাস ঋতু সম্বৎসরের পর্য্যাবর্ত্তন নাই, যেখানে প্রেম-সূর্য্যের সুবিমল আলোকে দিক্ বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়া রহিয়াছে,

সেই পুণ্যভূমির পবিত্র জ্যোতি সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সংসারবন্ধন আমাদিগকে শত বন্ধনে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন, ভোগ ঐশ্বর্য্যের তীব্র আকর্ষণ আত্মার ভাবকে নির্জীব করিয়া ফেলিতেছে। শমীতরুর ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমারদের অন্তরে, অথচ আমরা ইতর প্রাণীদিগের প্রাকৃতিক নিয়মের একমাত্র বশবর্ত্তী। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের পদছায়ায় সঞ্চরণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সাধন তপস্যাবলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একদিকে আমরা ভৌতিক জীব, আর একদিকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র, স্নেহের ধন আধ্যাত্মিক জীব। সংসারের তীব্র ঘূর্ণায় পতিত হইয়া আপনার উচ্চ অধিকার, বিমল আনন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকিয়া দিনযামিনী বৃথায় ক্ষেপণ করিতেছিলাম তাই বর্ষের শেষ মুহূর্ত্ত প্রাণে আঘাত দিয়া মর্ম্মস্থলকে প্রকম্পিত করিয়া আমাদিগকে জাগ্রত ও সচকিত করিয়া তুলিল।

আজ বর্ষের শেষ রাত্রি! এইকথা স্মরণ হইবা মাত্র যেন কি এক ভয়ানক তরঙ্গ হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। বর্ষচক্র নিঃস্তব্ধে ঘূর্ণিত হইয়া যেমন পূর্ণ এক বৎসরের শেষ নিশাকে আমারদের সম্মুখে আনয়ন করিল এমনই করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহা নিশাকে আমারদের সমীপস্থ করিবে তখন চিরজন্মের মত পৃথিবীর ধনঐশ্বর্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, রোরুদ্যমান হৃদয়বন্ধু সকলকে মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে, শোভা সৌন্দর্য্য হইতে চিরকালের মত নয়নকে মুদ্রিত করিতে হইবে, প্রাণের সহচর অনুচর জানিয়া যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার গঠন করিতেছি, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সকলের নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমার এ শরীরসম্বন্ধ বালুকণা ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইবে। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে ধমনীর রক্ত ধমনীতে রহিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে, রক্ত জলে পরিণত হয়, মস্তিষ্কের ভিতরে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, দণ্ডায়মান হইবার আর সাধ্য থাকে না। মনে হয় বাস্তবিকই কি আমার অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয়, সত্যই কি শরীর ধূলায় ধূসরিত হইবে অথবা আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে কোন এক অজানিত দেশে পলায়ন করিতে পারিলে যেন সে ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি হয়।

সম্বৎসরকাল পরে যে আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সকলে আগমন করিয়াছি, এখনই আমারদের শূন্য হৃদয়ে ঈদৃশ উদাস ভাবের অভিনয় হইতেছে। চঞ্চল কালস্রোত আমাদিগের হৃদয়ের জড়তা অপসারিত করিয়া দিয়া এককালে পৃথিবীর আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। আমরা যেন সমুদ্রগামী ভগ্ননৌকা নাবিকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপবেশন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া নিজ নিজ নিয়তির বিষয় চিন্তা করিতেছি। আজ নিরাশার পবন চতুর্দ্দিকে বহমান হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ে সুন্দররূপে প্রতিভাত না হইলে, বৈরাগ্যের ভাব অন্তরে সন্ধুক্ষিত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে স্থায়ীরূপে হৃদয়মন্দিরে রক্ষা ক-

রিবার জন্য মনুষ্যের ব্যাকুলতা জন্মে না। সংসারকে লইয়া যদি আমরা হৃদয়কে পূর্ণ করি, অথচ তাহার মধ্যে আবার ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হই, তবে কেমন করিয়া তাঁহার প্রীতি-পীযূষপানে কৃতার্থ হইতে পারি? আলোক অন্ধকার কেমন করিয়া এক সময়ে একস্থান অধিকার করিতে পারে। আত্মার পিপাসা অনুভব করিয়া তাহাতেই নীয়মান হইয়া লোকে ঈশ্বরের দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান হয় না, সেই জন্য সংসার ও ঈশ্বরকে এককালে সম্ভোগ করিতে গিয়া ধর্ম্ম হইতে ও ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয়। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন, যিনি হৃদয়ের স্পর্শমণি বোধে তাঁহাকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অতি যত্নে রক্ষা করেন, তিনিই সংসারে থাকিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সংসারের ক্ষতি বৃদ্ধি তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে পারে না। তিনি এখানে থাকিয়াই প্রতিকূল স্রোতের মধ্যেও পরম শান্তিলাভ করেন।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তো মৃতো ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আয়ুক্ষয়কর বর্ষকাল মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে মৃত্যু। অপোগণ্ড শিশু বালক যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুর অভিমুখীন। কে জানে কবে কাহার এই দেহের বিলোপ হইবে। মৃত্যুর করাল গ্রাসে কবে কাহাকে নিষ্পেশিত হইতে হয়। মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই ভয়াবহ সংসারের চারিদিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি। দাবানলপরিবেষ্টিত এই বধ্যভূমির মধ্যে থাকিয়াও আমরা সকল সময়ে নিজ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিজ নিজ আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। কেবল শোক দুঃখ ও বহির্জগতের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে। তাই আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া দুঃখ দুর্দ্দৈবের পরপারে সহজে উপনীত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বিপদবারণ পরমেশ্বরকে দীনভাবে আহ্বান করিতেছি, পোতকে নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।

করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে দুর্ব্বল জানিয়া কেন এই ভয়ানক পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলে, আমরা যে প্রতিপদে পরাজিত হইয়া তোমা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। আমারদের এমন বল কোথায় যে সংসারের তীব্র আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারি, “স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি” যিনি তোমাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণহীন হন না, এই যে উজ্জ্বল সত্য আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছ কই তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করিতেছি। যাহা সম্মুখে পাই তাহাতেই প্রীতি স্থাপন করিয়া যে সহস্র বৃশ্চিকদংশনে দংশিত হইতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া নশ্বর পদার্থ লইয়া হতসর্ব্বস্ব হইতেছি। আপনারও হৃদয়কে তাহাতে আহুতি দিতেছি। তোমাকে ত দেখিলাম না, তোমাকে ত প্রিয়রূপে উপাসনা করিলাম না! তোমার দিকে একপাদ অগ্রসর হইয়া পরক্ষণই যে আবার সহস্রপদ পশ্চাতে বিষ-

য়ের কূপে পতিত হইতেছি। আমারদের কি শোকতাপ বিলাপ ক্রন্দনের অবসান হইবে না। তোমার প্রীতিনীরে কি প্রাণভরিয়া সঞ্চরণ করিতে পারিব না। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, সকল আশা সকল ভরসা মনুষ্যে স্থাপন করিয়া যে পরক্ষণে গগনভেদী আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত দেখি, আমারদের কি এ মোহের শান্তি হইবে না। বিষজর্জ্জরিত দেহের ন্যায় যে আমারদের সকল চেতনার বিলোপ হইয়াছে। তোমার মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে সকলকে জাগ্রত কর, তোমার বিমল জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর।

সম্বৎসরকাল চলিয়া গেল। কেবল এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। সম্বৎসরকাল তোমার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া, রোগের ঔষধ শোকের সান্ত্বনা লাভ করিয়া আজ কোন্ প্রাণে তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি। সহস্র প্রকার সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি। তোমার সুশীতল ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিয়া কেমন করিয়া তোমার অতুলন পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হই। যিনি এক পল বিস্মৃত হইলে পৃথিবীর বিলয় দশা উপস্থিত হয় তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করি। সম্বৎসরকাল তোমার দিকে আহ্বান করিবার জন্য আমাদিগকে কত না অবসর প্রদান করিয়াছ। পাপমোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার কত না উপায় বিধান করিয়াছ। অসাড় আত্মাকে সচকিত করিবার জন্য কত না দুঃখ ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছ। হা জগদীশ! তোমার দয়ার কথা স্মরণ হইলে বাক্য স্তব্ধ হয়, কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে পরিণত হয়। আমরা মোহান্ধ জীব, সংসারের কীট, সৃষ্টিরাজ্যের বালুকণা। আমারদের উপরও এত দয়া! অধমসন্তানদিগের প্রতি এত বাৎসাল্য ভাব! পাপে কলঙ্কিত জীব, আমারদের উপরও এত মাতৃস্নেহ! আমরা পতিত জীব উদ্ধার করিবার জন্য এত যত্ন চেষ্টা! আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন স্নেহ করুণা স্মরণ রাখিতে পারি। তোমার করুণা নিমেষে নিমেষে আমারদের উপর অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। তুমি এখনই আমারদের প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিলে তাহারই গুরুত্ব মনে ধারণ করিতে পারি না। আমরা সাশ্রু নয়নে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদের পাপ মলা সকল মার্জ্জনা করিয়া দিয়া এ কলুষিত হৃদয়কে ধৌত বিধৌত করিয়া দাও, অভিনব জীবন দান কর যে সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে তোমার মহিমা মহীয়ান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। তোমার মোহন মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর, হৃদয়-সিংহাসনে অবতীর্ণ হও, যে সেরূপ দেখিয়া সংসার ভুলিয়া যাই—ইহকাল পরকালকে একসূত্রে আবদ্ধ করি, শোকতাপের মোহ কোলাহলের উপরিতন স্তরে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকি। অকিঞ্চন গুরু! আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না, তুমি আমারদের আশা ভরসা সকলই। অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় তোমা হইতে বহুদূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দীপ্তশিরা হইয়া আবার তোমার পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পাপের গ্লানিতে অনুতাপের নরকাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তোমার অমৃতবারি সিঞ্চনে

তাহাকে নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া ঈদৃশ ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা।

(উদ্বোধন)

গত রাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারিদিক নিঃস্তব্ধ হইল। বিশ্ব-চরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বজননী, শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেশ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীব-শরীরের যে কোন অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন—যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত—দিবা রাত্রিই তাঁহার কার্য্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্ব যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন—তাঁহার এই সংস্কার কার্য্য কেমন গোপনে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ স্বষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভাল বাসেন। যতক্ষণ তাঁহার স্বষ্টি জীবন ও সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহা-শিল্পী সেই মহা-রহস্যের আবরণ ক্রমশঃ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানব শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষী-শাবকের শরীর গঠন করেন—তিনি বীজ কোষে থাকিয়া বৃক্ষ-লতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন কর—যখন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না—যখন সেই স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি স্বষ্টি আরম্ভ হইল—প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহা-প্রাণের বিরাম নাই—জগতের মৃত্যু নাই।—তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র—তাহা প্রাণের লীন অবস্থা—তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জা-গৃহ মাত্র। ইহ লোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে

প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্ব্বার নব-সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন-রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ঐ দেখ পূর্ব্বদিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্রভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুমরাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্ব্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নব-বর্ষের উৎসবে, আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি—এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন।

ইতি পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ নামক আমার রচিত যে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া "আত্মা ও অহং বৃত্তি" নামক একটী প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের স্বপক্ষের যাহা বলিবার কথা তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ভারতীতে এতবার এত রকমে বলিয়াছি যে আবার সেই সকল পুরাতন কথা এখানে নূতন করিয়া বলা এক প্রকার যন্ত্রণা-বিশেষ। সামগ্রী রসালো হইলে কি হয়—একই সামগ্রীকে বারংবার ক্রমাগত কচ্‌লাইলে অমৃতও তিক্ত হইয়া উঠে। এ জন্য এখানে আমরা আবশ্যক মত তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিয়া শুদ্ধ কেবল এইটি দেখাইব যে, বিপিন বাবু আমাদের কথা খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহার আপনার কথাই আপনি খণ্ডন করিয়াছেন ও আমাদের কথাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সার গ্রন্থে বলিয়াছেন

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহং ইতি ধীবলাৎ।"

অর্থাৎ "সামান্যতঃ আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার (অর্থাৎ আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ দেকর্ত্তা বলিয়াছেন "I think therefore I am" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দুইটি প্রসিদ্ধ বচনের পরস্পর তুলনা-প্রসঙ্গে, আমি সাংখ্য-সারের উপরি-উক্ত বচনটির মধ্য হইতে "সামান্যত" এই শব্দটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; এতদুপলক্ষে বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার এই মত অর্থ করেন, যথা, আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলেই (এক কথায় অহংবৃত্তি বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়েন; উপরোক্ত বচনের মধ্যে যে সামান্যতঃ পদ আছে, তাহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন নাই।" বিপিন বাবুর মতে "সামান্য" এ কথাটি সামান্য কথা

নহে—তাহা এমনি-একটি অসামান্য গুরুতর কথা যে, তাহার উল্লেখ না করিলেই নয়। বিপিন বাবু হয় তো মনে করিয়াছেন যে "সামান্যত" এই শব্দটি আমার পক্ষের হানিজনক হওয়াতে আমি তাহা চুপে চুপে সরাইয়াছি; তাহা যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন—তবে সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। বচনটি এই—

'দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ"

অর্থাৎ সামান্যত আমি জানি এইরূপ বুদ্ধিবলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়, কি না আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে "সামান্যত" এই শব্দটি উল্লেখ না করিলেও ঐ বচনটির প্রকৃত তাৎপর্য্যের যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না—এক্ষণে তাহা আমরা দেখাইতেছি। ফরাসীস্ দেশীয় দেকর্ত্তার এই যে একটি বচন যে "আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ" ইহার অর্থই এই যে সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; অর্থাৎ আমি ইহা চিন্তা করিতেছি বা উহা চিন্তা করিতেছি—আমি ঘট চিন্তা করিতেছি বা পট চিন্তা করিতেছি—এরূপ বিশেষ বিশেষ চিন্তার কথা এখানে হইতেছে না, কিন্তু সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহা দ্বারাই আমার আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। এরূপ স্থলে 'সামান্যত' এ শব্দটি উল্লেখ না করিলেও উহা ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; এই জন্যই আমরা উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। যেখানে এক কথা বলিলেই মূল বচনের ভাবার্থ বুঝা যায় সেখানে আমরা দুই কথা বলিতে নারাজ। দেকর্ত্তা "সামান্যত" এ শব্দটিকে উহ্য রাখিয়াছেন—বিজ্ঞানভিক্ষু তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছেন—এই যা প্রভেদ, কিন্তু ফলে দুই কথার তাৎপর্য্য একই প্রকার। মনে কর গঙ্গার পরপারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—এপার হইতে আমি তাহা দেখিতেছি; সামান্যত আমি যাহা দেখিতেছি তাহা এই যে, প্রদীপ আলো দিতেছে; কিন্তু বিশেষত তাহা যে কুটীরের মধ্যস্থিত ঘটী বাটীতে আলোক দিতেছে তাহার প্রতি আমার লক্ষ নাই; ফলে, তাহা প্রদীপ কিনা ইহা জানিতে হইলে তাহা ঘটিতে আলোক দিতেছে বা বাটীতে আলোক দিতেছে এসকল বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন প্রয়োজন করে না; সামান্যত তাহা আলোক দিতেছে ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাহা প্রদীপই বটে। 'আমি ঘটি জানিতেছি' ইহা ঘটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'আমি বাটি জানিতেছি' ইহা বাটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'সামান্যত আমি জানিতেছি' ইহা আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে "সামান্যত" এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ যদি কেবল এইরূপ বলা যায় যে, "আমি জানিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ" তবে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্তু বিপিন বাবু 'সামান্যত' এই সহজ শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সঙ্গে 'অনুমান' এই আর একটি শব্দ যুড়িয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন 'দ্রষ্টা সামান্য অনুমান বলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন'। তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'অনুমান' কথাটী তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন—মূল বচনটিতে তো তাহার নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। বিপিন বাবু বলিতেছেন "সামান্য অনুমান বলে," আর এক জন বলিতে পারে "সামান্য জনশ্রুতির বলে", তৃতীয় ব্যক্তি বলিতে

পারে "সামান্য বিশ্বাসের বলে;" মূলের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলিতে পারে সুতরাং সেরূপ বলা'র কোন মূল্য নাই। যদি এরূপ হইত যে 'সামান্য' এই কথাটির উল্লেখ মাত্রেই অনুমান ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, তবে বিপিন বাবুর স্বপক্ষে সেই যা এক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো আর নহে। মনে কর, প্রথমত আমি প্রদীপ দেখিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি রঙ্‌মশাল দেখিতেছি এবং তাহার সঙ্গে ইহাও দেখিতেছি যে উভয়েরই সামান্য লক্ষণ ঔজ্জ্বল্য—রঙ্‌মশালের বিশেষ লক্ষণ শ্বেতবর্ণের আলোক; এখানে অনুমান কোন্‌খানটায়? আমি ঘটি জানিতেছি—বাটি জানিতেছি—ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সামান্যত ইহাও জানিতেছি যে 'আমি জানিতেছি;' অনুমান ইহার কোন্‌খানটায়? 'আমি জানিতেছি' ইহা কি অনুমান—না সাক্ষাৎ জ্ঞান?

বিপিন বাবু এখানে বলিতে পারেন যে যেমন ধূমদৃষ্টে বহ্নি অনুমিত হয়, তেমনি 'আমি জানিতেছি' এই জ্ঞান দ্বারা আমার আপনার অস্তিত্ব অনুমিত হয়; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; কারণ, যখন অগ্নি দৃষ্ট হইতেছে না—শুদ্ধ কেবল ধূমই দৃষ্ট হইতেছে, তখনই ধূম দৃষ্টে অগ্নির অনুমান সম্ভবে; কিন্তু যখন ধূমের সঙ্গে অগ্নিও দৃষ্ট হইতেছে তখন অগ্নিও প্রত্যক্ষে বিরাজমান, ধূমও প্রত্যক্ষ বিরাজমান, এবং দুএর যোগও প্রত্যক্ষে বিরাজমান। যখন আমি একটা ঘট দেখিতেছি, তখন ঘটপদার্থ আমার বাহিরে বর্ত্তমান ঘটজ্ঞান আমার অন্তরে বর্ত্তমান; কিন্তু যখন আমি আপনাকে জানিতেছি তখন অহং পদার্থও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, অহংজ্ঞানও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, এবং দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অভেদ-সম্বন্ধও আমার অন্তরে বর্ত্তমান। বিষয়-জ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান এ দুএর মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের বেলা—জ্ঞানের বিষয় (আমি) এবং জ্ঞান (আমি জানিতেছি) দুএর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানও যা, জ্ঞাতাও তা, জ্ঞেয় বিষয়ও তা, তিনিই এক। এই জন্য আত্মজ্ঞানের বেলায় এ কথা শোভা পায় না যে, আমি জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মাকে অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি; কেন না এখানে জ্ঞানও যা—আত্মাও তা—একই,—সুতরাং এককে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে দুইকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা হয়। অতএব 'আমি জানিতেছি' ইহা আত্মার অস্তিত্বের আনুমানিক প্রমাণ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ। এরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণের উপর বিপিন বাবুর কেন যে এত বিরাগ, তাহা বুঝিতে পারি না। বিপিন বাবু বলেন যে "এখনও কি শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু 'আমি জানি' এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন।" বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি আমাদিগকে "আমি জানি না" এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে বলেন? মনে কর একজন আসিয়া বলিলেন "বিন্ধ্যগিরিতে একটা আশ্চর্য্য দেবালয় আছে" ও তাহার প্রমাণ তিনি এই দিলেন যে তিনি নিজেও তাহা দেখেন নাই এবং আর কেহও তাহা দেখে নাই। বিপিন বাবু কি ইঁহার এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে পারেন? 'আমি জানি' এভিন্ন—জ্ঞান ভিন্ন—সত্যের প্রমাণ আর যে কি

জগতে আছে, আমরা তো তাহা জানি না। বিপিন বাবু নিজে কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন;" তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি —জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই তো অনুভবাত্মক? না আর কিছু? যাহা জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না তাহাকে অবশ্য তিনি অনুভবাত্মক বলিতে পারেন না। ইহা সত্ত্বেও বিপিন বাবু বলিতেছেন যে "অহং বৃত্তি লোপ হয় হউক, এরূপ বাদ দিলে যে অজ্ঞেয় শূন্যাকার অথচ সত্তামাত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা।" 'অজ্ঞেয়' অর্থাৎ কেহই তাহাকে জানে না—জানিবে না—জানিতে পারে না; সুতরাং সেরূপ আত্মাকে বিপিন বাবুও জানেন না এবং অন্য কাহারও তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ না জানা কথার যিনি উপদেশ দেন তিনিই বা কিরূপ উপদেষ্টা, এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন তিনিই বা কিরূপ শিস্য, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। গুরু মদ্দা-ছাগল দোহন করিতেছেন এবং শিস্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য চালুনী ধরিয়াছেন;—কৌতুকের চড়ান্ত! ইহারই নাম "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—এক অন্ধ আরএক অন্ধের পথ-প্রদর্শক। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কখনই আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পারেন না, কেননা জ্ঞাত বিষয় কখনই অজ্ঞেয় শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তবেই হইতেছে যে, অজ্ঞেয়-বাদী আত্মাকে জানেন না; যদি তিনি আত্মাকে না জানেন, তবে তিনি আত্মার সম্বন্ধে যতই বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করুন্ না কেন, সমস্তই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ।

কিন্তু বিপিন বাবু তাঁহার স্বপক্ষের প্রমাণার্থে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাকে—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে—সহায় ডাকিতেছেন; তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।

এবং তিনি ইহার অর্থ করিতেছেন "আত্মার সচ্চিদংশ ও বুদ্ধিবৃত্তি এই দুই পদার্থকে জীব অবিবেক হেতু সংযোগ করিয়া 'আমি জানি' এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়"। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, এখানকার এই যে 'আমি জানি' ইহা স্বতন্ত্র, এবং আমরা যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা স্বতন্ত্র। 'আমি জানি' বলিতে দুই প্রকার 'আমি জানি' বুঝায়,—প্রথম, লৌকিক ব্যবহারের "আমি জানি" এবং, দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞানের "আমি জানি"। লৌকিক ব্যবহারকালে আমি যখন বলি যে, আমি গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, তখন আমার শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই "আমি" শব্দ প্রয়োগ করি, সুতরাং তখন আমি আমার শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানি; শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে এইরূপ অবিবেকাত্মক "আমি জানি"ই সচরাচর লোকে প্রচলিত—"সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।" লৌকিক ব্যবহার কালে আমরা এরূপ করি বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা-কালে আমরা আত্মাকেই 'আমি' বলিয়া জানি—শরীরাদিকে নহে। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক "আমি জানি" অবিবেক-জনিত; শেষোক্ত আধ্যাত্মিক "আমি জানি" বিবেক-জনিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে অবিবেক-জনিত লৌকিক "আমি জানি"ই দূষ্য; বিবেক-জনিত আধ্যাত্মিক

'আমি জানি' সাধকের পরম শ্রেয়স্কর। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যের গোড়াতেই আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর (অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের গোচর) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ নহে; কি তবে তাঁহার মত-বিরুদ্ধ? দেহাদিকে আমি বলিয়া জানাই তাঁহার মত-বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার অবিকল অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

"তুমি (অথবা "ইহা" "উহা") এবং "আমি" এই দুইরূপ প্রত্যয়ের গোচর, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব যে, বিষয় এবং বিষয়ী, এ দুয়ের মধ্যে যখন পরস্পর ঐক্য হইতে পারে না তখন তাহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের মধ্যেও যে ঐক্য হইতে পারে না ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর চিদাত্মক বিষয়ীতে যুস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, অথবা বিষয়েতে বিষয়ীর এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত। তথাপি একের সত্তা ও ধর্ম্মেতে অন্যের সত্তা ও ধর্ম্ম আরোপ করত পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে অবধারণ না করাতে—অত্যন্ত পৃথক্ যে উল্লিখিত ধর্ম্মদ্বয় ও ধর্ম্মিদ্বয় তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সত্য এবং মিথ্যা দুয়ে জড়িত এইরূপ লোক-ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায় যে, আমি এই (শরীর বা মস্তিষ্ক ইত্যাদি), আমার এই (গৃহ বা ভূমি ইত্যাদি)।"

এইরূপ দেখা যইতেছে যে, শরীরাদিকে আমি বলিয়া জানাই শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ—আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী। শঙ্করাচার্য্যের মতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা, এবং যুস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি, এই দুইকে একত্র মিশাইয়া খিচুড়ি পাকানো'র নামই অবিবেক, এবং উভয়ের পার্থক্য রক্ষা করা'র নামই বিবেক। এ উপলক্ষে স্কটলাণ্ড দেশীয় তত্ত্ববিৎ হামিলটন কি বলিতেছেন পাঠক তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল শৃগালেরই এক রায়; হামিলটন বলিতেছেন—

"But the something of which we are conscious, and of which we predicate existence in the primary judgement, is two fold,—the ego and the nonego, we are conscious of both and affirm existence of both. But we do more, we do not merely affirm the existence of each out of relation to the other, but, in affirming their existence we affirm their existence in duality, in difference, in mutual contrast (ইহার নাম বিবেক); that is, we not only affirm this ego to exist, but deny it existing as the nonego; we not only affirm the non-ego to exist, but deny it existing as the ego.

শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মত এই যে, যুস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি এবং অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা এই দুইকে জড়াইয়া এক করিয়া ফেলাই অবিদ্যা। আমার প্রতিবাদীরা বলিতেছেন—আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন চা'লে ডা'লে খিচুড়ি হয়; ইঁহারা বলিতেছেন ডা'ল ব্যতিরেকেও শুধু চা'লে খিচুড়ি হয়। এটা ইঁহারা দেখিতেছেন না যে, আত্মাকে অস্মৎ-প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলে উল্টা আরও যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি হইতে তাহার পার্থক্য রক্ষা করা হয় এবং ইহারই নাম বিবেক ; আত্মাকে দেহাদির সহিত জড়াইয়া ফেলার নামই অবিবেক। আমরা তাই বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে "আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয়" শঙ্করাচার্য্যের এই গোড়ার কথাটীকে অবিদ্যাজনিত বলিলে তাঁহার অধ্যাস-বাদের পাকা ভিত্তিমূল কাঁচিয়া যায়। আমার প্রতিবাদিরা বলিতেছেন "না—তাহা কাঁচিয়া যায় না ; আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট খিচুড়ি পাকানো হয়—যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদির সহিত তাহাকে জড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই (শুধু চা'লেই খিচুড়ি পাকানো হইতে পারে ডা'লের কোন প্রয়োজন নাই)," অথচ শঙ্করাচার্য্য চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন যে আত্মা এবং দেহাদি এ দুইকে জড়াইয়া একীভূত করিবার নামই খিচুড়ি পাকানো। এখন, শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিব—না ইঁহাদের কথা শুনিব?

বিপিন বাবু শঙ্করাচার্য্যের নিম্ন-লিখিত প্রসিদ্ধ বচনটিও উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং।
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।

এই শ্লোকটির অর্থ প্রকৃত-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রভেদই বা কোন্‌খানে এবং অভেদই বা কোন্‌খানে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। বিষয়টি অতি গুরুতর, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হওয়া সুকঠিন, এ জন্য বারান্তরে তাহার রীতিমত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল আমাদের বক্তব্যের স্বল্প মাত্র আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছি।

লোকে কথায় বলে যে "তেলে জলে কিছুতেই মিশ খায় না"—তেলে জলে এত যে প্রভেদ, তথাপি, একটা কাচের পাত্রে তেল ও জল রাখিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটী চক্রাকৃতি অভেদ-স্থান লক্ষিত হয় ; সেই অভেদ-স্থানটিকে তৈল-রেখাও বলা যাইতে পারে—জল-রেখাও বলা যাইতে পারে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তথাপি উভয়ের অভেদ-স্থান আছে—যেমন সুষুপ্তি। সুষুপ্তির যদি জ্ঞানের সহিত আদবেই কোন সংস্রব না থাকিত—সুষুপ্তি যদি একেবারেই অজ্ঞেয় হইত—তবে তাহার সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারিতাম না যে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'। সুষুপ্তির সহিত যে-অংশে জ্ঞানের সংস্রব আছে সেই অংশে সুষুপ্তির অভ্যন্তরে অহংবৃত্তিও আছে এবং সেই অংশেই আমরা বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; সুষুপ্তি যে-অংশে অজ্ঞানাবস্থা সে অংশে আমরা তাহা বলি না—বলিতে পারিও না ; কেননা একেবারেই যাহা জ্ঞান-বহির্ভূত তাহার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহা অনর্থক বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রার সময় আমি সত্যসত্যই জ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আমি স্মরণ করিয়া বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম ; তাহা যদি না হইত, তবে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এ কথার কোন অর্থই থাকিত না। এই জন্য বিপিন বাবুর এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না যে, সুষুপ্তিকালে আমাদের অহম্বৃত্তি বিলুপ্ত হয়।

উপরি-উক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানেই প্রভেদ সেইখানেই প্রভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটা না একটা অভেদ-স্থান আছেই আছে। তেমনি আবার দেখানো যাইতে পারে যে, যেখানেই অভেদ-স্থান সেইখানেই তাহা প্রভিন্ন বস্তু-দ্বয়ের অভেদ স্থান। তেল আর জলের মধ্যে যদি প্রভেদ বিলুপ্ত হয়—তেলটুকু যদি কোন মহাপুরুষের মন্ত্রবলে জল হইয়া যায়—তবে উভয়ের সেই অভেদ-রেখাটিও দৃষ্টি হইতে পলায়ন করে। কঠোপনিষদে আছে

> "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। তথাপি উভয়ের অভেদ স্থান এই যে, উভয়ই আত্মা। ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা এই অভেদ-স্থানটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "শিবোহং শিবোহং।" এই অভেদ-স্থানটিতে পরমাত্মার সংস্পর্শে জীবাত্মার পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইবারই কথা এবং পুণ্যের খদ্যোত-জ্যোতি ব্রহ্মানন্দের সূর্য্যালোকে কবলিত হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু সেই যে অভেদ স্থান—তাহা তো আর অজ্ঞেয় শূন্যাকার নহে; তাহা জ্ঞান-জ্যোতি ও আনন্দ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সেই অভেদ স্থানে যখন আত্মা বিরাজমান তখন কাজে-কাজেই বলিতে হইতেছে যে, সেখানে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কেননা আত্মা-মাত্রেরই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহা জ্ঞানও বটে জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞেয়ও বটে—আত্মা মাত্রই আপনাকে আপনি জানে; যে—আপনাকে আপনি জানে না, তাহাকে আত্মা বলাও যা—দেয়াল বলাও তা'—একই। তবে আর উপরি-উক্ত অভেদ-স্থানীয় পরম পরিশুদ্ধ আত্মাকে অজ্ঞেয় বলি কিরূপে? তিনি কি আপনার নিকটে এবং সাধকের নিকটে জ্ঞেয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তবুও কি বলিতে হইবে যে, তাঁহার নিকটে আত্মা অজ্ঞেয় শূন্যাকার ছিল? শঙ্করাচার্য্যের নিকট যদি পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় শূন্যাকার হইতেন, তবে তিনি অন্য ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দিবার অধিকারীই হইতেন না; কেন না, তাঁহার নিজেব নিকটে যাহা অজ্ঞেয়—তিনি নিজে যাহা জানেন না—তাহা তিনি অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে যা'ন—ইহা কত না লজ্জার কথা!

অতএব বিপিন বাবু পঞ্চদশীর এই যে, একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

> "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ"

অর্থাৎ জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয়—ইহার আদবেই কোন অর্থ নাই। প্রদীপান্তরের অভাব-প্রযুক্ত প্রদীপ কি কখনও অদৃশ্য হয়? তবে জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয় হইবে কেন? প্রদীপ প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি প্রদীপকে অদৃশ্য বলিতে হইবে? জ্ঞান প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি জ্ঞানকে অজ্ঞেয় বলিতে হইবে? প্রদীপ যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞান তেমনি আপনার আলোকে আপনি জ্ঞাত—তবে আর জ্ঞান অজ্ঞেয় কি রূপে? জ্ঞাত বস্তুকে অজ্ঞেয় বলা কি রূপ কথা?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা আত্মাকে স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন কি না? যদি করেন—তবে তিনি বলিতে পারেন না যে, "বিদ্যতে নানুভাব্যতা" আত্মা অনুভব-যোগ্য নহে; যদি না করেন—তবে তাঁহার উপদেশ মূলেই অনুভবাত্মক নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল বিতণ্ডা ও শব্দাড়ম্বর মাত্র। তবে আর বিপিন বাবুর এ কথা কোথায় রহিল যে "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন?" তিনি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছেন—সমস্তই তো তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ—তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও তো অনুভবাত্মক কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনে কর যেন ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ এক পয়সাও নাই—তাহা নিতান্তই অজ্ঞেয় শূন্যাকার, অথচ ব্যাঙ্ক হইতে হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাহির হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; এরূপ ব্যাঙ্ক নোটের কি কোন মূল্য আছে? যিনিই ব্যাঙ্কে নোট ভাঙাইতে যাইবেন তিনিই অজ্ঞেয় শূন্যাকার দেখিবেন—অন্ধকার দেখিবেন, ও শূন্যহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিবেন। প্রদীপ যদি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করে, নিজেই যদি অপ্রকাশ হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান যদি আপনাকে আপনি না জানে, আপনার নিকট আপনি অজ্ঞেয় হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে জানিবে? এই জন্যই আমরা বলি যে, যিনি 'অনুভবাত্মক' সত্যের প্রয়াসী, অথচ 'আমি জানি' এমন একটি সুনিশ্চিত অপরোক্ষ অনুভূতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অনুভবাতীত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ইচ্ছা করিয়া নিপতিত হন, তাঁহার সেরূপ পতনের কারণ আর কিছু নয়—যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ—অনুভবাত্মক সত্য সংস্থাপন করিতে গিয়া অনুভবের মূলোচ্ছেদ।

শিক্ষা। .

আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, ইত্যাদি রূপ আমি-তত্ত্বের জন্য আমরা জগতে মহান ভিক্ষুক হইয়া রহিয়াছি। এই সকল ভিক্ষার তরে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জগত এই সকল ভিক্ষা দিয়া কি আমাদের তৃপ্তি সাধন করিবে? করিতে পারিবে? পারিবে, যদি জগত ধনী হয়, তাহার এত ধন থাকে যে আমাদের দিয়া তাহার প্রচুর থাকিতে পারে। কিন্তু জগত এত ধনী নয় তাই আমাদের ভিক্ষার কাছে জগত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—কহে "আমার তোমাদের ভিক্ষা যোগাইবার সামর্থ্য নাই।" তখন জগতের দারিদ্র্য বুঝা যায়, আমাদের ভিক্ষার কাছে তাহার হীনতা উপলব্ধ করা যায়, তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুৎপিপাসু পথিকের ন্যায় ছটফট করিতে করিতে জগতের নিকট হইতে ফিরিয়া আসি এবং জগতের অতীত দেশে যাইতে চেষ্টা করি কিন্তু সহসা পারি না। সেখানে অমূল্য অসীম ধনাগার স্থাপিত আছে; বিশুদ্ধবেশে অনবরতঃ জাগরূক রহিয়া পাহারা দিতেছে। এই নিয়মকে করায়ত্ত করিতে না পারিলে জগতের অতীত দেশে আমরা পঁছিতে পারিব না সুতরাং সেথায় জ্যোতিস্মান ধনীর জ্যোতি-

ষ্মান ধনাগারও দেখিতে পাইব না,—আমাদের দারিদ্র্য দুঃখও ঘুচিবে না। অতএব যদি সেই নিয়ম প্রহরীকে আমরা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারি তাহা হইলে অসীম ধনাগারও আমাদের আয়ত্ত হইবে। সেই অসীম ধনাগারের অসীম অনন্ত ধন পাইলে আমাদের কোন্ ভিক্ষা না পূর্ণ হইবে? সমুদয় ভিক্ষাই পূর্ণ হইবে এই জন্য বলি নিয়মকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে করায়ত্ত করাকর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা হইতে সমুদয় শিক্ষা প্রাদুর্ভূত হয়। শিক্ষা যদি থাকে তবে সে ইহাই। ইহা ভিন্ন শিখিবার তো আর কিছুই নাই। ইহাই আমাদের চরম পরম উন্নত শিক্ষা। এই শিক্ষা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের বাজে কত শিক্ষা আবশ্যক হয়। মূল শিক্ষা এই। ইহা ভিন্ন আর কাহাকে প্রকৃত শিক্ষার নামে উপযুক্ত বোধ করা যাইতে পারে? বিজ্ঞান জ্যোতিষ যাহাই শিখিতেছি সব ইহাকে অবলম্বন করিয়া। ইহা তখন অগ্নি শিখাস্বরূপ। সকলের উপরে। যেমন আলোক বজায় রাখিবার জন্য তৈল সুতা প্রভৃতি দ্রব্যের সাহার্য্য আবশ্যক হয় সেইরূপ নিয়মায়ত্তের শিক্ষা আমাদের আলোকের স্বরূপ। ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য আমাদের চারিধার হ'তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষার সংগ্রহ করিতে হয়। না হইলে ইহা প্রকাশ পাইবে কিরূপে? ইহার প্রকাশ যত যেখানে তত সেখানে বল তেজ হাসি খেলা! ইহার অপ্রকাশে সমুদয় বিশৃঙ্খল ভগ্ন চূর্ণ। অতএব নিয়মায়ত্তই জগতের প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষায় হিত প্রস্ফুটিত।

হিতেন্দ্র

আলোচনা।

(গত আষাঢ় মাসের পত্রিকার ৪৮-পৃষ্ঠার পর।)

ভৌতিক জগতের উপর মানুষের নিয়ন্তৃত্ব।

আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, অতি স্বল্প বলিয়া অনেক সময়ে আমরাই যাহার কারণ, আমরা ঈশ্বরকে তাহার কারণ, নির্দ্দেশ করি এবং তাহা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকি। যতই মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে,ততই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ পূর্ব্বে যাহা একমাত্র ঈশ্বরের সাধ্যায়ত্ত মনে করিত, তাহা মানুষেরও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। মারীভয় হইলে পূর্ব্বে ভগবানই তাহার প্রেরক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মারীভয়ের কারণ ঈশ্বর নহেন, মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণই তাহার কারণ এবং মনুষ্যের জ্ঞান-প্রভাবেই তাহা দূর করা যায়। বিজ্ঞান এইরূপ কত অলৌকিক কার্য্য করিতেছে যাহা মনুষ্যের সাধ্যের অতীত বলিয়া লোকে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিত। এইরূপ ক্রমেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ভৌতিক জগতের উপর ঈশ্বর মানুষকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছেন, মানুষ সে ক্ষমতা সেই পরম পিতার প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে স্ফুরিত ও সমন্নত করিতে পারিলে সে ঈশ্বরের সাহায্যে ও অনুশাসনে ভৌতিক মঙ্গলামঙ্গলের অনেক পরিমাণে নিয়ন্তা হইতে পারে। এই নিয়ন্তৃত্ব মানুষের কতদূর হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই জানি না; যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে ততই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন আমাদের

দোষে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা অসতর্কতা-পূর্ব্বক ঈশ্বরে আরোপ না করি।

আয় ব্যয়।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪৭৭৸৴ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৫৭৷৶১০
সমষ্টি	৪৪৩৫৵১৫
ব্যয় ...	১৫৫৬৷৷০
স্থিত	২৮৭৮৷৷৶১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২১৩৷৷৶০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত		২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮০৯ শকের আষাঢ় হইতে মাঘ পর্য্যন্ত		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০৮ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮০৯ শকের মাঘ পর্য্যন্ত		২৪৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৫৲
তাঁহার স্ত্রী		১০৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর		৪৲
,, ,, মণিলাল মল্লিক		৪৲
,, ,, দিননাথ অধ্যেতা		২৲
,, ,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলী	২৲
,, ,, কেদারনাথ মিত্র		২৲
,, ,, লালবিহারী বড়াল		২৲
,, ,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য		২৲
,, ,, কাশীনাথ দত্ত		২৲
,, ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়		১৲
,, ,, মহানন্দ মুখোপাধ্যায়		১৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ধর		১৲
,, ,, রাধামোহন সিংহ	আঁচুল	১৲
,, ,, বনমালী চন্দ্র		১৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী		৫৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণি দাসী		৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
,, ,, নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৩৪৲
,, ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল		৪৲
,, ,, ভবদেব নাথ	গোয়াড়ী	৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়		৫৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲

এককালীন দান।

শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী		১৷০
,, কামিনীসুন্দরী দেবী		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী		১৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়		২৪৷৶০
		২১৩৷৷৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৮ ৶০
পুস্তকালয় ...	১০৬৸৶৷০
যন্ত্রালয় ...	৫০৯ ৶৫
গচ্ছিত ...	২১৭৷৷৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬২৷০
দাতব্য ...	৯০৲
সমষ্টি	১৪৭৭৸৴৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫০৪৷৷০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৬১৸৶১০
পুস্তকালয়	৮৩৷৷৴১৫
যন্ত্রালয়	৫৮৫৸৶১০
গচ্ছিত	৫৩৷৷৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫৸১০
দাতব্য	৬১৲
সমষ্টি	১৫৫৬৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫০৯ সংখ্যা
১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মা এবং পরমাত্মা।

আমাদের আত্মা স্বয়ং পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডল (globe) যেমন মহাকাশের প্রতিকৃতি, আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে কিরণাবলীর ন্যায় রেখা-সকল যতদূর ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইয়া পরিমণ্ডলের অবয়ব যতই বর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই অসীম আকাশে পরিণত হইতে পারিবে না; সেইরূপ আত্মা আপনার ধীশক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি প্রসারণ করিয়া যতই জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিবর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই পরমাত্মার সহিত একীভূত হইতে পারিবে না। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় প্রভেদ সর্ব্বকালেই বলবৎ থাকিবে। পরিমণ্ডলকে যেমন মহাকাশ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, পরমাত্মা সেইরূপ জীবাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতেছেন; আর, পরিমণ্ডল যেমন স্বীয় পরিধির সীমা-পর্য্যন্তই মহাকাশকে স্পর্শ করিয়া আছে, জীবাত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকে কিয়ৎ পরিমাণেই জানিতেছে। যাঁহার জ্ঞান-ধর্ম্মের যতটুকু পরিধি পরমাত্মা তাঁহার নিকট সেই অংশে প্রকাশিত হ'ন। পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন, কিন্তু কাহারো নিকট সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং—যদি মনে কর যে আমি পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানি তবে নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের স্বরূপ তুমি অল্পই জানো।"

কোন প্রতিবাদী এখানে বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন—এ কথাটা কি সত্য? জ্ঞানবান্ লোকের মধ্যে সকলেই কি আস্তিক? ইহার উত্তর আমরা এইরূপ দিই—

আমরা যাহা কিছু দেখি—সমস্তই দৃশ্য আবির্ভাব মাত্র—তাহার কোনটিই মূল-বস্তু নহে—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। দৃশ্য-আদি আবির্ভাবের মূলে আধার-বস্তু আছে—ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। সমস্ত জগতের একই মূলাধার, ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত;

কেবল সেই মূলাধার কিরূপ ইহা লইয়াই যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ। এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? অবশ্য—জ্ঞান, তা ভিন্ন আর কে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর—জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান যখন বলিতেছে যে, দৃশ্য আবির্ভাব-সকলের মূলাধার আছেই আছে” তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সেই মূলাধার জ্ঞানের নিকটে অপ্রকাশ নাই; কেননা, মূলাধার জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াতেই জ্ঞান বলিতেছে “মূলাধার আছেই আছে” নতুবা আর কিসের জোরে জ্ঞান ওরূপ কথা বলিতে সাহসী হইবে? ঈশ্বর তাঁহার আপনারই প্রদত্ত মনুষ্য-জ্ঞানে আপনি আবির্ভূত হ’ন; রাজা যেমন তাঁহার আপনার প্রদত্ত প্রিয়-জনের ভবনে আপনি আতিথ্য গ্রহণ করেন—সেইরূপ। সমস্তের মূলাধার—মনুষ্যের জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই,—জিজ্ঞাস্য শুধু কেবল এই যে, তিনি জ্ঞানে কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? যদি বল যে, মূলাধার দৃশ্য বস্তুরূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সে কথার কোন অর্থ নাই; কেননা যাহা চক্ষে দৃষ্ট হয় তাহা দৃশ্য আবির্ভাব-মাত্র, তাহা মূল বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হয়, তাহা স্বয়ং মূল-বস্তু নহে। যদি বল যে, মূলাধার শূন্য-রূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সেরূপ কথারও কোন অর্থ নাই; কেননা শূন্য কিছুই নহে—যাহা কিছুই নহে তাহার প্রকাশ অসম্ভব। অতএব জগতের যিনি মূলাধার তিনি স্বয়ম্ভু আত্মা রূপেই জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন—এ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। স্বয়ম্ভু আত্মা—অর্থাৎ তিনি আমাদের ন্যায় অপূর্ণ আত্মা নহেন, কেননা অপূর্ণ আত্মা অনেক অংশে অন্যের উপর নির্ভর করে; যিনি মূলাধার পুরুষ তিনি অন্য কাহারো উপর নির্ভর করেন না—তাঁহারই উপর সমস্ত জগৎ নির্ভর করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জগতের যিনি মূলাধার তিনি পরিপূর্ণ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভু পরমাত্মা-রূপে আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন; অথচ অনেক সময়ে আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে এইরূপ মনে করি—যেন আমাদের নিকটে তিনি অপ্রকাশ রহিয়াছেন। আমরা আমাদের অভ্যাস-দোষে চক্ষের উপলব্ধি বা হস্তের উপলব্ধিকেই উপলব্ধি মনে করি, জ্ঞানের উপলব্ধিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরি না; আমরা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াও মনে করি—যেন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছি না। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে এরূপ নিগূঢ় ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন যে, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখি না; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ বলিতে আমরা অধিকারী নহি যে, তিনি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন না। বণিক্ যেমন টাকা দিয়া টাকা উপার্জ্জন করে, শিষ্য যেমন বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধি উপার্জ্জন করে—আপনার অপরিস্ফুট বুদ্ধি দিয়া গুরুর পরিপক্ক বুদ্ধি উপার্জ্জন করে; মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপের দর্শন লাভ করে—ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের দর্শন লাভ করে। পরমাত্মার দর্শন-লাভের এরূপ সহজ উপায় সত্ত্বেও শুষ্ক বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞান দিয়া অজ্ঞান ক্রয় করেন—আলোক দিয়া অন্ধকার ক্রয় করেন; তাঁহাদের জ্ঞানের ফল এই যে, পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র জগতের মধ্যে তাঁহারা কেবল অজ্ঞান-অন্ধকারই দর্শন করেন। তাঁহারা বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিয়া

শেষে পা'ন এই যে, তাড়িত-পদার্থে সকলই হয়—তাহারই শক্তি-মাহাত্ম্যে অন্ধকার হইতে আলোক পরিস্ফুট হয়, জড় হইতে প্রাণ পরিস্ফুট হয়, অজ্ঞান হইতে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়; জগতে এমন কোন অসাধ্য ব্যাপার নাই যাহা তাহার কর্ত্তৃত্বের সীমা-বহির্ভূত;—বাস্তবিকই যেন তাঁহারা তাড়িত পদার্থের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব দিব্য-চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন! এই অন্ধ শক্তিটিই জড়বাদী প্রভৃতি শুষ্ক বৈজ্ঞানিক-দিগের স্পর্শমণি; এবং ইহার উপার্জ্জনে তাঁহারা অশেষ বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু জ্ঞান এমন যে দুর্লভ ধন, তাহা কি অন্ধ-শক্তি ক্রয় করিবার জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তবে হীরক দিয়া কাচ ক্রয় করা কি দোষ করিল? যাঁহারা জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপকে ক্রয় করেন, তাঁহারাই জ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যয় করেন; তাঁহারা

> "সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।"

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত কৃতাত্মা বীত-রাগ এবং প্রশান্ত হ'ন।

জীবাত্মা প্রকৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা জীবাত্মা এবং প্রকৃতি সমস্ত ব্যাপিয়া সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী; পরমাত্মা দ্বন্দাতীত অটল প্রশান্ত নিরঞ্জন। সংসার, সত্য এবং মিথ্যার, আলোক এবং অন্ধকারের, জীবন এবং মৃত্যুর, দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র; জীবাত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সকল দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে,—ক্রমে অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হয়, অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হয়, মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হয়, এইরূপে শান্তি হইতে শান্তিতে পদনিক্ষেপ করে। জীবাত্মা পৃথিবীর গর্ত্ত-নিহিত বীজ-স্বরূপ, পরমাত্মা সূর্য্য স্বরূপ; সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে সেই বীজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আকাশে পর্য্যুত্থান করে—এবং সেই সূর্য্যেরই আলোক আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন হইতে নবতর জীবন লাভ করিতে থাকে। এরূপ জীবন-লাভের অন্ত নাই, যেহেতু পরমাত্মা-রূপ সূর্য্য অনন্ত জীবনের অক্ষয় ভাণ্ডার।

জীবাত্মা যখন আপনার জন্য কার্য্য করে, তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে স্বার্থ কহে; আর,যখন সে পরমাত্মার জন্য কার্য্য করে তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে পরমার্থ কহে। আমাদের মন নানা প্রকার কামনার আশয়; কোনটি বা প্রসুপ্ত, কোনটি বা জাগ্রত,—যেমন শত্রুর দর্শন-মাত্রে মনোমধ্যে তাহার অনিষ্ট-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে, শত্রুর অদর্শনে তাহা প্রসুপ্ত থাকে; কোনটি বা মুখ্য, কোনটি বা গৌণ,—যেমন ভূমি-কামনা উপস্বত্ত্ব লাভের জন্য, সুতরাং উপস্বত্ত্ব-কামনা মুখ্য —ভূমি-কামনা গৌণ; আবার, উপস্বত্ত্ব-কামনা সুখ-সাধনের জন্য, সুতরাং সুখ-কামনা মুখ্য—উপস্বত্ত্ব-কামনা গৌণ; কোনটি বা বৈধ কোনটি বা অবৈধ—কামনা-সকল এইরূপ বিচিত্র ভাবাপন্ন; সেই সকল কামনা উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিবার জন্যই মনুষ্য প্রথমতঃ বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। বুদ্ধি উপস্থিত কামনাকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিয়া কামনা-চরিতার্থতার সাধারণ নিয়ম-সকল অবধারণ করে; ইহাতে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অভিমান জন্মে—অহংকার জন্মে; অতঃপর বুদ্ধির অহঙ্কার এবং মনের বিষয়-কামনা দুয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ উপস্থিত হয়। যেই

অহংকার মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, অমনি বিষয়-কামনা আসিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া দেয়। অহংকার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে নিতান্তই অসমর্থ। শুদ্ধ কেবল আপনার কামনার চরিতার্থতাতেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের লক্ষ্য আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কামনা-সকল বিপথে ধাবিত হইয়া বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত হয়—ও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-অভিমানকে বৃথা করিয়া দেয়। সাধারণ জন-সমাজের বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইলে আমারও বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইবে—অতএব তাহারই প্রতি যত্ন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য, এইটিই শুভ বুদ্ধি। লোক-সমাজের বৈধ কামনা-সকলের চরিতার্থতায় সহায়তা করিতে হইলে আপনার বুদ্ধির অহংকার দমনে রাখিয়া সকলের নিকট হইতে সুবুদ্ধি গ্রহণ করা আবশ্যক—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট হইতে, বর্ত্তমান সাধু মণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির নিকট হইতেই সুবুদ্ধি ও সুপরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং সকলের সকল প্রকার শুভবুদ্ধি যাঁহাতে একাধারে বর্ত্তমান—সকল শুভ বুদ্ধির যিনি একমাত্র প্রেরয়িতা—সেই সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা এবং তাঁহার অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইহারই নাম পরমাত্মার জন্য কার্য্য করা—ইহাই পরমার্থ। পরমার্থ-পথেই মনুষ্যের বৈধ কামনা-সকল উপযুক্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—স্বার্থ-পথে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবে না।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অতি মূঢ় ব্যক্তিরই নিকট এসংসার রমণীয় ভাবে প্রতিভাত হয় কিন্তু স্থির চিত্তে অল্পক্ষণ মাত্র জ্ঞানশক্তির চালনা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই বোধ জন্মে যে এই আপাতমধুর সংসার বস্তুত বহু শোক-সমাচ্ছন্ন। জরা মৃত্যু হইতে ভয়, ব্যাধি বৈকল্য হইতে ভয়, হিংস্র জন্তু ও ততোধিক হিংস্র মনুষ্য হইতে ভয়, এবং সাধারণত প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়যোগে ভয়—এইরূপ নানাভয়ে মনুষ্য সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে। সংসারে যে সুখ দেখা যায় তাহাও বস্তুত সুখ নহে সুখের আভাস মাত্র। মনুষ্যের দেহ এরূপে গঠিত যে কোন অনুকূল বিষয়ের উপস্থিতিতেও যখন সুখের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ দেহে স্নায়বীয় বিপ্লব ঘটে, তাহার গর্ব্ভে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহা যথার্থ যে—“দুঃখ যেন দুদিন সুখ খদ্যোতিকা হেন মনরে নিশ্চিত জেন সংসারকান্তারে”। দুঃখের প্রতিবিধান করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সংসারের ক্লেশ আলোচনা করিয়া যখন মনুষ্য উক্ত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তখন তাহাকে কে আশ্বাস দিতে পারে? পৃথিবীতে এমন এক দল মনুষ্য আছেন তাহারা দুঃখের অন্ত জিজ্ঞাসুকে দুঃখের কখনই শেষ নাই এরূপ বলিয়া দুঃখের প্রতিবিধিৎসা ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। অনেক সাংসারিক জ্ঞানে মহা জ্ঞানী ব্যক্তি এই দলের অন্তর্ভূত এবং তাহাদের কথায় শ্রাদ্ধাবান লোক

ও অনেক। কিন্তু ইহা অতি সহজেই বোধগম্য হয় যে যাহা যে জানে না তাহাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা বৃথা। যাহার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা তাহার পক্ষে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ নাই এরূপ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "কেহ কি দুঃখ নাশের উপায় দেখাইতে প্রস্তুত আছেন" এবং এরূপ কাহাকে দেখিলে প্রথমতঃ তাহার বাক্য অনাস্থেয় ইহা সপ্রমাণ না হইলে "দুঃখের অন্ত নাই" এই সর্ব্বহারক তামসিক জ্ঞানকে কখনই বরণ করিবেন না। ইহার বিপরীত সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। যিনি দুঃখের অন্ত না দেখিয়া এরূপ স্থির করিয়াছেন যে দুঃখের অন্ত হইতেই পারে না দুঃখের অন্তপ্রত্যাশীর পক্ষে তাঁহার বাক্যের উপযোগিতা নাই। আর, যিনি বলেন যে দুঃখের অন্ত আছে তাঁহার কথার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে বিবাদ উঠিতে পারে কিন্তু তাহার বাক্য যে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপযোগী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বভাষায় শুনা যায়—

> "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।
> ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি!
> অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।"
> যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

অতএব শ্রেয়ার্থীর দ্রষ্টব্য যে এই সকল বাক্য শ্রদ্ধেয় কি বন্ধ্যাপুত্র খপুষ্পাদিবৎ অর্থশূন্য। স্বেচ্ছায় এই দৃষ্টি রোধ করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে এই সকল বাক্য সন্দেহস্পৃষ্ট নহে। ইহাদের মধ্যে "হইতে পারে" "বোধ হয়" এরূপ কোন ভাব নাই, ইহারা নিশ্চয়রূপে অবধারিত। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে কিরূপে এই সন্দেহসঙ্কুল জগতে এ প্রকার সুমেরুতুল্য অচল বাক্যরাশির প্রচার হইয়াছে। সমুদায় জগৎ যাহাকে অপ্রমাণ করিতে যত্নশীল জগতে তাহার বক্তাই বা কিরূপ সম্ভব হয় আর তাহাতে লোকের বিশ্বাসই বা কিরূপে হয়! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যাহারা উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধাশীল এবং তদুচিত সাধন করিতে যত্নবান দিন দিন তাঁহাদের দুঃখ শমিত হয়। ইহাও প্রত্যক্ষ যে যাহারা উল্লিখিত পথ অবলম্বন করিয়া অভীপ্সিত দেশাভিমুখে অগ্রসর হন তাঁহাদের অনেকের মধ্যে তদ্দেশ লাভের প্রমাণ তাঁহাদের বাক্যে ও তদনুযায়ী লিঙ্গ দ্বারা প্রদর্শিত হয়; অন্যেরা উক্তরূপে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও প্রতিদিন তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও পরিণামে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দৃঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, আর অনেকে বিশেষরূপ লব্ধকাম না হইলে তাহা নিজের দোষ নিবন্ধন এইরূপ স্থির বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রীই উদ্দেশ্যকে দোষ দিয়া যাত্রা হইতে বিরত হ'ন। ইহাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি কোন ব্যভিচার লক্ষিত হয় না।

সুবোধ লোক মাত্রই ইহাতে স্থির করেন যে দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা স্বকর্ম্মসাধনে সক্ষম। এরূপ আস্তিক্য বুদ্ধি সত্ত্বেও নানা সংশয় উপস্থিত হয়। কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ নাশের উপায় প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং নিজ নিজ মত সমর্থনের নিমিত্ত নরহত্যাদি

মহা পাপাচরণে কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ ধর্ম্মঘটিত বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধ নাস্তিকতার একটি প্রধান উদ্দীপক। কিন্তু সমরধূলি স্থিত হইলে যখন অন্ধকার দূর ও দৃষ্টি বাধা-শূন্য হয় তখন প্রকাশিত হয় যে যেমন মহা বাত্যায় সমুদ্রের উপরিভাগ মাত্র আলোড়িত হয় কিন্তু তাহার অভ্যন্তর দেশ অবিচলিত ভাবে স্থির থাকে সেইরূপ এসকল অশান্তির মধ্যে যথার্থ যে সুখস্বরূপ প্রাপ্তির উপায় (যাহা ধর্ম্মের নামান্তর) তাহা অক্ষুণ্ণ একই ভাবে বিরাজমান। ধর্ম্মের যে অংশ লইয়া বিবাদ তাহা অকিঞ্চিৎকর, দেশকালপরিচ্ছিন্ন ও সাধকদিগের প্রকৃতিবৈচিত্র্যজাত। আর যে অংশ নির্ব্বিবাদ তাহা সার, নিত্য ও সত্যের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে যে সকল অমঙ্গল ধর্ম্মকে কলুষিত করে তাহা একেবারে নিঃশেষিত হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে তাহাদের চরম লক্ষ্য একই। সত্য প্রাপ্তিকে সকল ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিদিত করাই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। যেরূপ সাগর সমুদায় নদীরই শেষ গতি তদ্রূপ পরমেশ্বরই ধর্ম্মনদী সমূহের একমাত্র সাগর। সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে বিদিত হইলেই মনুষ্য মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয় ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই উক্তি।

সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদমামনন্তি—
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি,
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।”

তাহা সেই একাক্ষর প্রণবের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, সত্যই যাঁহার স্বরূপ। ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে পরমেশ্বর স্বরূপতঃ(কার্য্যতঃ নহে) যে কি বা কেমন তাহা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাক্যের অগোচর ও মনের অগোচর। হে দম্ভিন্, হে অশান্ত মনুষ্য, তুমি চিন্তা করিয়া এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে কি ও কেমন তাহা স্থির কর। যখন তুমি ইহাতে অক্ষম তখন জগতাতীত জগদীশ্বর যে কি ও কেমন তুমি কি উপায়ে স্থির করিবে? সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই দর্শন করেন যে পরমেশ্বরতত্ত্ব সর্ব্ব ধর্ম্মে একই রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়ও সর্ব্বত্র একই। যে বৈষাদৃশ্য তাহা কেবল মাত্র বাহ্যিক। সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়,

“সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক জ্ঞানেন।”

এই যে আত্মা তিনি সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা লভ্য হয়েন।

‘সত্য’ শব্দের অর্থে যে কেবল স্বীয় অনুভূত বিষয়কে যথাতথভাবে পর বুদ্ধি সংক্রমণ করা তাহা নহে। যে যথার্থ বাক্য নৈষ্ঠুর্য্য বা পৈশুন্যদোষাশ্রিত তাহা ধর্ম্ম্য নহে ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেরূপ বাক্য ধর্ম্ম্য তাহা এই,

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

যে বাক্য শ্রোতার উদ্বেগ করে না যে বাক্য যথানুভূত যাহা শ্রোতার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক হিতকর তাহাই ধর্ম্ম্য তাহাই যথার্থ সত্য। এবং এই সত্যই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম সম্পৎ। “তপঃ” শব্দের অর্থে শরীরপীড়ন নহে, “মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।” মনঃ ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। মন অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ইহাদের পরমেশ্বরের অভিমুখী হও-

নের নাম তপস্যা। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ক্রিয়াশক্তির আরম্ভ হয় বলিয়া ইহা প্রথমে উক্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন করা বিধেয় কেননা ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তির অধীন। যাহার পরমেশ্বরে প্রীতি নাই তাহার পুণ্য ক্রিয়াও সাধন পক্ষে নিষ্ফল। অতএব ঈশ্বরে প্রীতিরূপ সম্পত্তি নিঃসংশয় অমূল্য।

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

হে পরমেশ্বর বিবেকহীন ব্যক্তিগণের নশ্বর বিষয়ে যেরূপ প্রীতি তাহা তোমাকে যথা নিয়ম চিন্তা করি যে আমি আমার হৃদয় হইতে যেন প্রস্থান না করে। অর্থাৎ আবিবেকির যেরূপ শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগ সাধকের পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ প্রীতি হয়। যাঁহাদের পরমেশ্বরে এইরূপ প্রীতি হয় তাঁহারা ধন্য। একেবারে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী প্রীতি লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে দুর্ঘট। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ, বিষয়ের প্রলোভনবশতঃ, সাংসারিক দুঃখের তীব্র পীড়ন বশতঃ আমরা সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর হইতে বহির্মুখ হইয়া পড়ি। মনকে অন্তর্মুখ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুণ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে অনুষ্ঠানের ফল ঈশ্বরে প্রীতি কেন না স্বভাবতই ঈশ্বর পরপ্রেমাস্পদ! ক্রিয়া দ্বারা সেই প্রীতির বিরোধী যে সকল ভাব তাহারই নিষ্কাশন হয়। ঊর্দ্ধদেশ হইতে পড়িতেছে যে বস্তু বাধাবশতঃ তাহার পতন রোধ হয় এবং পরে সেই বাধার অভাব হইলে তাহা পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা বলিয়া বাধা নিষ্কাশন কখন উক্ত বস্তুর পতনের কারণ হইতে পারে না। ইহাও তদ্বৎ। ক্রিয়ার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইলে ঈশ্বরে প্রীতির বর্দ্ধন হয় অর্থাৎ অন্য বিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিলে স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতি প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহাতে প্রীতি হয় আমাদের ক্রিয়াহেতুক নহে। সেই প্রীতিকে অন্য বিষয়ে স্থাপন করিয়া স্বীয় অবনতি করা কিম্বা তদ্বিপরীত আচরণে স্বীয় উন্নতি করা আমাদের ইচ্ছাধীন।

কিরূপ ক্রিয়া দ্বারা উক্ত অর্থ সাধিত হইতে পারে? ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু এক বিষয়ে কাহার মতভেদ নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে সর্ব্বলোকের হিতকামনা করিবে, শুভানুষ্ঠায়িকে উৎসাহিত করিবে, বিপন্নকে করুণা করিবে এবং দুরাচারিকে উপেক্ষা করিবে। যে সকল ক্রিয়া ইহার অনুকূল তাহাই আচরণীয়, তদ্বিপরীত হেয়।

এই সাধনগুলির সঙ্গে অপর একটী সাধন প্রয়োজন তাহা "সম্যকজ্ঞান" অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ। যে সকল ঈশ্বর সম্বন্ধায় বিশ্বাস আপাততঃ মধুর হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা সর্ব্বতোভাবে হেয়। সাধক তাঁহাকে স্বরূপতঃ

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"

এবং কার্য্যতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের এক মাত্র চেতন কারণ বলিয়া জানেন। নতুবা তাহার সাধন বৃথা হইয়া যায় কেননা তাহার প্রীতি যথার্থ পাত্রে স্থাপিত হয় না। জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা যাঁহার সত্তার উপলব্ধি হয়, যাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অতীত অথচ যিনি অচিন্ত্য শক্তিযোগে

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসং শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজ মব্যয়ং ॥

তিনিই এক মাত্র পরম প্রীতির আস্পাদ অপর কেহ নহে। অতএব বিশেষ সাবধানতার সহিত কুসংস্কার হাতব্য।

যাঁহারা এই সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ধন্য। সর্ব্ব জগতের একমাত্র ঈশ্বর, সর্ব্ব মনুষ্যের একমাত্র পিতা মাতা আমাদের হৃদয়কে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করুন যাহাতে আমরা সর্ব্ব বাসনাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ চির শান্তি ও অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে পারি ইহাই একাগ্রচিত্তের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ॥

বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান।

বেদান্তীরা প্রথমে শিষ্যদিগকে নৈত্যিক (যাহা প্রতিক্ষণে হইতেছে) বৈষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী উপদেশ করেন, বুঝান, পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন বা বুঝান। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, স্বতঃসিদ্ধ মানবীয় জ্ঞান কিম্বিধ প্রণালীতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবস্থা বা বিভাগ কতপ্রকার, এ সকল না জানিলে, না বুঝিলে, বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত ও উৎপাদন করা যায় না। যে ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ নৈত্যিক বিষয়িক জ্ঞানের প্রণালী ও গতি বুঝে না, জানে না, সে ব্যক্তি বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনধিকারী। বেদান্তীদিগের এই অভিপ্রায় বজায় রাখিয়া, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ আমরা বেদান্তমতের নৈত্যিক জ্ঞানের বা নিত্যানুভূত বিষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী ও বিভাগ বর্ণন করিব।

বেদান্ত মতে মানবীয় জ্ঞানের প্রথমতঃ দুই মুখ্য বিভাগ প্রদর্শিত আছে। অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি ও অনুভব তুল্য কথা। এবং স্মৃতি ও স্মরণ তুল্য কথা। এই দুই মুখ্য বিভাগের অবান্তর বিভাগ ভ্রম ও প্রমা। এই দুই মুখ্য বিভাগ লৌকিক ভাষায় ক্রমান্বয়ে মিথ্যা ও সত্য. নামে ব্যবহৃত বা উল্লিখিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মানবগণের ভ্রমাত্মক অনুভব, প্রমাত্মক অনুভব, ভ্রমাত্মক স্মৃতি ও প্রমাত্মক স্মৃতি হইতে দেখা যায়। এই দুই বিভাগ সমান সমালোচ্য ও সমান অনুসন্ধেয় হইলেও বেদান্তীরা প্রথমে প্রমা জ্ঞানেরই স্বরূপ অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রমা কি? কিম্বিধ জ্ঞানের নাম প্রমা? এতথ্য নিশ্চিত হইলে তৎসঙ্গে অপ্রমা বা ভ্রম আপনা হইতেই নিশ্চিত বা স্থির হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রমাজ্ঞানই বিবেচ্য।

স্মৃতি বিভাগ বাদ রাখিয়া, কেবল মাত্র অনুভব বিভাগীয় প্রমা বুঝিতে হইলে, এইরূপে বুঝিবে।—"যে জ্ঞান অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, বা অবগাহন পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই অনুভব বিভাগীয় প্রমা।" আর স্মৃতি ও অনুভব, উভয় সাধারণ। প্রমা বুঝিতে হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা," এইরূপে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "অনধিগত" বিশেষণটী ত্যাগ করিলেই প্রমাসামান্যের আকার স্থির হইবে।

বিবরণ—উপরোক্ত সূত্রভূত কথার বিবরণ এইরূপ—জ্ঞান-নির্দোষ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বস্তু যৎস্বরূপ, ঠিক তৎস্বরূপ বা তদাকার মনোবৃত্তি (মনে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বস্তুর ছবি হওয়া) অনধিগত-যাহা পূর্ব্বানুভূত

নহে। অবাধিত—যাহার বাধ হয় না, অর্থাৎ পরীক্ষা কালে যাহার অন্যথা হয় না। সমুদয় কথার নিষ্কর্ষ বা নির্গলিতার্থ এই যে, যে জ্ঞানের বা যে মনোবৃত্তির (বস্তু ছবির) বিষয় বা বস্তু জ্ঞানোত্তরকালেও থাকে, পরীক্ষা করিলেও অন্যথা হয় না, তিরোহিত হয় না, সেই জ্ঞান বা সেই মনোবৃত্তি প্রমা-শব্দের বাচ্য। বাহ্যিক দূরত্বাদি দোষ নাই, আন্তরিক ইন্দ্রিয়-বৈকল্যাদি দোষ নাই, এমন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক প্রভাবে যদ্রূপ বস্তু ঠিক তদ্রূপ মনোবৃত্তি (ছবি) জন্মিয়া থাকে, অন্যথা হইলে অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ প্রমা হয় না, ভ্রমই হয়। জ্ঞানগোচরিত বস্তুর স্বরূপ ঠিক থাকিলেই, অন্যথা না হইলেই অর্থাৎ পরীক্ষায় টিকিলেই তাহা অবাধিত বলিয়া গণ্য। কখন কখন রজ্জু-চক্ষুঃ-সংযোগের পর রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্প জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের সে সর্প পরীক্ষায় টিকে না, অন্যথা হয়, অর্থাৎ ইহা সর্প নহে, এরূপ পুনঃপ্রতীতি হয়, সুতরাং সে সর্প বাধিত। এরূপ অন্যথা জ্ঞান, বা একে আর জ্ঞান, কোন রূপ দোষ থাকিলেই হয়, দোষ না থাকিলে হয় না।

পেচকগণ স্ফীতালোক সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার অনুভব করে, তাহা তাহাদের নেত্রদোষ। কেহ কেহ রক্ত বর্ণকে কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত বর্ণকে পীত বর্ণ মনে করে, সে সমস্তই তাঁহাদের চক্ষুর দোষ। আমরা সকলেই বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য্যকে হস্তপ্রমাণ দেখি, সুতরাং তাহা আমাদের দোষ নহে, বাহ্যিক দূরত্ব-দোষই আমাদিগকে উহাকে ঐরূপে প্রদর্শন করায়। অতএব বাহ্যিক বা আন্তরিক কোন প্রকার দোষ (প্রতিবন্ধক) বিদ্যমান থাকিলে প্রমোৎপত্তি হয় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যে জ্ঞান দোষাভাব সহকারে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানেরই বিষয় অবাধিত ও অব্যভিচরিত হয়। অন্যথা বা অন্যরূপ হয় না। বাধিত শব্দের পরিবর্ত্তে মিথ্যা শব্দের ব্যবহার করিতেও পার। বাধিত—মিথ্যা। অবাধিত—সত্য। অতএব যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান। ইহাও মনে রাখিতে হইবেক, এ সত্য ব্যবহারিক সত্য। স্মৃতিজ্ঞান প্রমা বটে, কিন্তু ইহার বিষয় সে সময়ে উপস্থিত বা বিদ্যমান থাকে না। চিত্তে পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের সংস্কার থাকে, উদ্বোধক উপস্থিত হইলে, সেই সংস্কারই তদাকারে (তদ্বস্তুর আকারে) অভিব্যক্ত হয়। কাযেই এই জ্ঞান বিদ্যমান-বিষয়-নিরপেক্ষ। বিষয় বিদ্যমান থাকে না, কেবল মাত্র পূর্ব্বানুভব-জনিত-সংস্কার-বলে উদিত হয় বলিয়া, স্মৃতিজ্ঞানটী স্বপ্নসদৃশ অস্পষ্ট। অনুভবের সহিত স্মৃতির এই মাত্র প্রভেদ দেখিয়া যাঁহারা স্মৃতি জ্ঞানকে পৃথক্ শ্রেণী করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনধিগত বা অননুভূত এই শব্দটীকে বিষয়বিশেষণ দিবেন। অর্থাৎ অনধিগত (অননুভূত) ও অবাধিত বস্তু অবগাহী জ্ঞানই প্রমা, এইরূপ বলিবেন। যে বস্তু অননুভূত, পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই অথচ অবাধিত অর্থাৎ মিথ্যা নহে, এমন বস্তু যে-জ্ঞানের বিষয়, সেই জ্ঞানই প্রমা। ইহাই প্রমা লক্ষণ, এই লক্ষণই মনে রাখিবেন।

যখন কোন ধারাবাহী জ্ঞান জন্মে তখনও তদন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (আলম্বন বস্তু) নিম্নলিখিত প্রকারে অনধিগত বলিয়া গণ্য, তদনুসারে, স্মৃতিঘটিত প্রমাজ্ঞানের লক্ষণও তাদৃশস্থলে অব্যাপ্ত নহে। অর্থাৎ ধারাবাহী জ্ঞানের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে এ প্রমা লক্ষণ বজায় থাকে।

প্রণালী যথা—কালের কোন রূপ (রং) না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়বেদ্য, ইহা অনেক পণ্ডিতের স্বীকার আছে। সেই স্বীকার অনুসারে, ইন্দ্রিয়-জনিত-মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান যখন যে-বস্তু অবগাহন করে বা গ্রহণ করে, তখনই সে তদবচ্ছিন্ন বা তদ্বিশিষ্ট (তৎসঙ্গে) ক্ষণাদিরূপ সূক্ষ্ম কালকেও অবগাহন করে, গ্রহণ করে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধারাবাহী জ্ঞানের প্রথম জ্ঞানটী প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটকে অবগাহন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলি দ্বিতীয়াদিক্ষণবিশিষ্ট ঘট গ্রহণ করিয়াছিল। ঘট এক হইলেও যেমন শ্বেত ঘট, রক্ত ঘট, পীত ঘট, এইরূপে ভিন্ন, তেমনি, প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, তৃতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, ঐরূপে বিভিন্ন। যদি বিভিন্নই হইল, তাহা হইলে আর দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (অবগাহ্য ঘট) অধিগত বা পূর্ব্বানুভূত বলিয়া গণ্য হইল না, সুতরাং প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের অব্যাপ্তি দোষও (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া) হইল না।

বিস্তার—উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তার এইরূপ—কখন কখন এমন হয়, কোন এক জ্ঞান দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিরাজিত থাকে। সে দীর্ঘ জ্ঞান কখন আপনা আপনি কখন বা ইচ্ছাবলে সেরূপ স্থায়ী হয়। দেবচিন্তক, ঈশ্বরোপাসক, ভাবুক, শোকমগ্ন, প্রেমমগ্ন, এইরূপ এইরূপ লোককে প্রায়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় ভাব্য বিষয়ক জ্ঞানকে দীর্ঘ বা স্থায়ী করিয়া রাখিতে দেখা যায়। এইরূপ দীর্ঘ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, তাদৃশ দীর্ঘ (লম্বা) বা স্থায়ী জ্ঞান এক জ্ঞান নহে, তাহা জ্ঞানধারা। অর্থাৎ তাহা উত্তরোত্তর সংলগ্ন বহু জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম ধারাবাহী জ্ঞান। ঘট বিষয়ক ধারাবাহিক জ্ঞানের আকার এইরূপ "ঘট ঘট ঘট ঘট—।" এক প্রযত্নে অনেকগুলি ঘটজ্ঞান শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র সংলগ্ন হইয়া যায় বলিয়াই উহাদের মধ্যবর্ত্তি চ্ছেদ অনুভূত হয় না, সুতরাং একটীর ন্যায় দেখায় অর্থাৎ এক বলিয়া বোধ হয়। অতএব ধারাবাহি জ্ঞানের মধ্যে যে জ্ঞানটী প্রথম, সেইটী ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই প্রমালক্ষণে অব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রমা লক্ষণে লক্ষিত হয় না। ভাবিয়া দেখ, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান যে ঘট অবগাহন করিয়াছে, পুনর্ব্বার সেই ঘটই দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় হইতেছে সুতরাং দ্বিতীয়াদি জ্ঞান অধিগত বিষয়-বিষয়ক হইল, অনধিগত বিষয়-বিষয়ক হইল না। অনধিগত-বিষয় বিষয়ক না হওয়াতেই অনধিগত-ঘটিত প্রমালক্ষণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে থাকিল না। অথচ সে সকল জ্ঞান প্রমা মধ্যে গণ্য। এ সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় সে প্রণালী এই—ধারাবাহি জ্ঞান পরপর সংলগ্ন বহুজ্ঞান হইলেও তদন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের সমন্বয় আছে। যথা—প্রথমতঃ কালের ইন্দ্রিয়বেদ্যতা স্বীকার কর। কোনরূপ রূপ না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়-বেদ্য। ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। কেমন করিয়া? তাহা বিবেচনা কর। অনুস্বার ও বিসর্গ যেমন পৃথক্ উচ্চারিত হয় না, কোন একটা বর্ণের যোগ ব্যতীত উচ্চারিত হয় না তেমনি, কালও ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তুর যোগ ব্যতীত পৃথক্ অনুভূত হয় না। যখন যে ইন্দ্রিয় যে-বস্তু গ্রহণ করে, তখন সেই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুর সঙ্গে

স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও গ্রহণ করে। "এখন ঘট আছে" ইত্যাকার জ্ঞানের "এখন" অংশটুকু কালবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যখনই তুমি চক্ষুঃ দ্বারা ঘট দেখিয়াছ, তখনই তৎসঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও দেখিয়াছ। যে পর্য্যন্ত ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন নামে খ্যাত। চক্ষুঃ যদি ঘটের সঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকে না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, "এখন" এতদ্রূপ কালবোধক অংশ বা জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কে উৎপাদন করিয়া দিল? অতএব, বিবেচনা করা উচিত, ঐ স্থলে চক্ষুই ঐ জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, অন্য কেহ করে নাই। কালের রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তজ্জন্য কাল দেখা যায় না, শুনা যায় না, এ সকল প্রবাদ বা এ সকল নির্ণয় অস্বাতন্ত্র্যমূলক ভিন্ন অন্যমূলক নহে। অর্থাৎ কাল অনুস্বার বিসর্গের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপে বা পৃথক রূপে অনুভবগম্য হয় না। ইন্দ্রিয়গৃহীত কালের উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয়বেদ্যতা অঙ্গীকার করিলে অবশ্যই ধারাবাহী জ্ঞানের অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় গুলিকে অর্থাৎ বিভিন্ন-ক্ষণ-বিশিষ্ট বিভিন্ন ঘট পর পর গুলিকে অনধিগত বলিয়া গণ্য বা অঙ্গীকার করিতে পার। কেন না, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানেরই বিষয়, তাহা প্রথমে জ্ঞানে অধিগত হয় নাই। যে ঘট প্রথম জ্ঞানে অধিগত হইয়াছে, সে ঘট প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, সুতরাং সে ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানের অধিগত নহে। ঘট বস্তু এক হইলেও যেমন শ্বেতঘট পীতঘট এবম্প্রকারে রূপে ভিন্ন, তেমনি ঘট বস্তু এক হইলেও প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, এবম্প্রকারে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়াই প্রদর্শিত-প্রকারে লক্ষণদোষ নিবারণ করা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্ত, ধারাবাহিক জ্ঞান একই জ্ঞান; পর পর সংলগ্ন বহুজ্ঞান নহে। যে পর্য্যন্ত ঘটরূপ বিষয়ের স্ফুরণ থাকে সেই পর্য্যন্ত ঘটাকারা মনোবৃত্তি একই বৃত্তি; নানা বা বহু নহে। উৎপন্ন মনোবৃত্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যে পর্য্যন্ত স্ববিরোধ বৃত্তি অর্থাৎ অন্যরূপ বৃত্তি উৎপন্ন না হয়, সে বৃত্তি সেই পর্য্যন্ত বিরাজিত থাকে। ঘটাকারে মনোবৃত্তি জন্মিল, সে বৃত্তি, পটাকার অথবা অন্য কোন প্রকার মনোবৃত্তি উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে না। এই নিয়ম অনুসারে ঘটধারাবাহি বুদ্ধি স্থলে যে সুদীর্ঘ ঘটাকারাবৃত্তি বিরাজিত থাকে, তাহা একই বৃত্তি; বহু নহে। যেমন বৃত্তি এক, তেমনি, তাবৎকালস্থায়ী তৎপ্রতিফলিত (ঘটাকার মনোবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত) চৈতন্য রূপ জ্ঞানও এক, অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞান এক জ্ঞান; বহুজ্ঞান নহে। এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত, এসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ধারাবাহিক জ্ঞানে অবশ্যই প্রমালক্ষণ লক্ষিত হইবেক সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত থাকিবেক।*

বলিতে পার, বেদান্ত মতে এসকল কিছুই সত্য নহে, ঘট পট, সমস্তই মিথ্যা। ঘট যদি মিথ্যাই হয়, তবে অবশ্যই তাহা বাধিত; বাধিত হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা"

---

* লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে ন্যায় ভাষায় তাহাকে অব্যাপ্তি বলে। স্থূল কথা এই যে লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যব্যাপক হওয়া চাই। ধারাবাহী জ্ঞান প্রমামধ্যে গণ্য তজ্জন্য তাহা লক্ষ্য, লক্ষণ তাহাকে স্পর্শ করিতেদিল না, কাযেই অব্যাপ্তি দোষ হইতে দিল।

এলক্ষণ একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং ঘটজ্ঞান প্রমা না হইয়া অপ্রমামধ্যে নিবিষ্ট হইল। ঘট জ্ঞান কেন, কোনও জ্ঞান প্রমা হইল না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ সকল বাধিত সত্য; ঘটও বাধিত সত্য; কিন্তু সংসার দশায় বাধিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সমস্তই অবাধিত বলিয়া গণ্য। যখন ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে তখন এ সকল বাধিত বা মিথ্যা হইবে। ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় অসত্য বলিয়া স্থির হইবে। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বেদান্তবাক্য যথা—"যখন এ সকল আত্মপর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শীর আত্মভূত হয়, তখন সে কি দিয়া কি দেখিবে?" "যখন দ্বৈততুল্য হয় অর্থাৎ আমি, আমার, ইত্যাদিবিধ কল্পিত ভেদবুদ্ধি থাকে, তখনই জীব অন্য হইয়া পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বা অনুভব করে।" এই দুই শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মযাথার্থ্য সাক্ষাৎ-অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার দশায় সমস্ত ব্যবহার্য্য অবাধিত। অতএব সংসারী জীবের সংসারদশার প্রমা কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য যে, প্রমা লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্গত অবাধিত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ সংসারদশায় অবাধিত। ফলিতার্থ অর্থ এই যে, সংসার দশার যে-জ্ঞান, সংসারদশার অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই সংসারদশায় প্রমা। এই লক্ষণই সম্পূর্ণ লক্ষণ। এ লক্ষণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; কোথাও অব্যাপ্ত নহে। যতকাল আত্মসাক্ষাৎকার না হইবে, ততকালই এইরূপ প্রমা, প্রমার উৎপাদক প্রমাণ, তন্নিষ্ঠ প্রামাণ্য, এইরূপ এইরূপ সমস্তই ব্যবহার অলুপ্ত থাকিবেক, সত্য বলিয়া গৃহীত হইবেক, কোনও ব্যবহার মিথ্যা বা লোপপ্রাপ্ত হইবেক না। অর্থাৎ ইহা মিথ্যা হইলেও কেহ ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিবেক না। এ সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী আচার্য্য বলিয়াছেন, যতকাল আত্মনিশ্চয় না হয়, আমি কি, কিংস্বরূপ, তাহা স্থির না হয়; ততকাল দেহাত্ম জ্ঞানের ন্যায় এ সকল জ্ঞান প্রমাণ অর্থাৎ লৌকিক ঘট পটাদি জ্ঞান প্রমা বলিয়া গণ্য।* প্রমা বা সত্যজ্ঞান নির্নীত হইল। এক্ষণে তাহার জনক বা উৎপাদক কে ইহা বলিতে হইবেক। কিরূপে উক্ত লক্ষণ প্রমা উৎপন্ন হয়, কে উৎপাদন করে? উৎপাদক অনুসারে উহার কত প্রকার বিভাগ বা শ্রেণী নির্ব্বাচিত হইতে পারে? এক্ষণে এই সকল বর্ণিত হইবেক।

ক্রম প্রকাশ্য।

ব্রাহ্মের আদর্শ।

প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীগণের আদর্শ কোন না কোন মানুষ বা কাল্পনিক জীব, কিন্তু ব্রাহ্মের আদর্শ ব্রহ্ম। যদিও বাইবেলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে চেষ্টা কর, তথাপি কার্য্যতঃ খ্রীষ্টীয়ানগণ খ্রীষ্টকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ মহম্মদকে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মালম্বীগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম কোন মানুষকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন না, ঈশ্বরই তাঁহার আদর্শ। পরকালে

---

* এখন অর্থাৎ সংসার দশায় দেহকে আমি বলিয়া জানিতেছি। ইহা আমাদের ভ্রম সত্য; কিন্তু তাহা জানিয়াও জানিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। সুতরাং এ অবস্থায় দেহাত্মজ্ঞান আমাদের নিকট অপ্রমা বলিয়া গণ্য নহে; প্রত্যুত প্রমা বলিয়া গণ্য। ঘটাদি জ্ঞানকে ও ঐরূপ জানিবে!

অনন্তকাল যিনি মানুষের আদর্শ থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে ইহলোক হইতেই আদর্শ-রূপে বরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এই সার উপদেশের দ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম ॥

অর্থাৎ "কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, কারণ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবর্জ্জিত।"

এই মত সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত ভাবে ও উপাসনা করেন না, আবার সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত ভাবেও উপাসনা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে ভগবদ্গীতার ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে দেখিয়া থাকেন। ঈশ্বর দ্বৈতভাবসমন্বিত, কারণ সৃষ্টি হইতে তিনি বিভিন্ন—সৃষ্টির জড়ত্ব ও অন্যান্য গুণ বিবর্জ্জিত, আবার তিনি অদ্বৈতভাব সমন্বিত, কারণ সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাঁহার গাঢ় যোগ—অনন্তকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; এমনি সম্বন্ধ যে তাঁহার গাঢ় আলিঙ্গন হইতে সৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হইলে তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বর এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির সঙ্গে অভেদ বলিতে হয়। এই দ্বৈতাদ্বৈত মতই সত্য মত।

ঐশ্বরিক প্রেম।

পৃথিবীর ঘটনা দেখিয়া ঈশ্বর মানবকে প্রীতি করেন কি না তদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ ও অনন্ত। পূর্ণ ও অনন্ত প্রেমের গতি ও কার্য্য অপূর্ণ ও অন্তবৎ জীবের নিকট সহজবোধ্য নহে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ সুতরাং মানবীয় প্রেমের নিয়মে ঐশ্বরিক প্রেম নিয়মিত হইবে এরূপ হইতে পারে না। যখন ঐশ্বরিক প্রেমের কার্য্য বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, তখন সেই প্রেমে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই জ্ঞানীর কার্য্য। ঈশ্বর এই চরাচর অনন্ত জগতের অনন্ত ক্ষেত্রে শান্তভাবে চিরকাল আপনার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কাহারও হাস্য ক্রন্দন দ্বারা বিচলিত হয়েন না।

সাধু পার্কারের ধর্ম্ম।

মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার পৃথিবীর এক জন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার ন্যায় সাধু লোক বর্ত্তমান কালে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। আজীবন তিনি ধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকে তিনি ধর্ম্ম বলিতেন না। ব্রাহ্মদিগের ন্যায় শরীর মন ও আত্মার সমান উৎকর্ষ সাধনকেই তিনি ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই উচ্চ ধর্ম্মে মতি রক্ষা জন্য তিনি যে কয়েকটী নিয়ম সদাসর্ব্বদা পালন করিতেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। এই নিমিত্ত প্রকৃ-

তির কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিবে, ঈশ্বরের চিন্তা করিবে, তাঁহার উপর আমরা কতদূর নির্ভর করি তাহা উপলব্ধি করিবে, দুই সন্ধ্যা প্রার্থনা করিবে এবং যখনই ভক্তিভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে তখনই তাঁহার উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের নিকট আমরা সুখ চাহি না তথাপি তিনি আমাদিগকে সুখ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনি আমাদিগের হৃদয়গত নির্ম্মল নিঃস্বার্থ প্রার্থনা সকল পূর্ণ করিতেছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কল্পনা হইতে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সম্বন্ধীয় অপবিত্র চিন্তা সকল দূর করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক উন্নতি সাধন নিমিত্ত এই নিয়ম পালন করিবে যে যখন যে বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল হইবে তখনই সেই বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবে। ইহার জন্য কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না, নিজে গাঢ় রূপে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। তৃতীয়তঃ শারীরিক উন্নতি সাধন জন্য আহার ও পানে অপরিমিতাচার বর্জ্জন করিবে, প্রত্যহ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শারীরিক পরিশ্রম করিবে, প্রত্যহ ছয় ঘণ্টাকাল বা যতক্ষণ তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। এইরূপে শরীর মন ও আত্মার এককালীন উন্নতি সাধন করিবে। এই উন্নতি সাধনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

প্রার্থনা।

সংসারের পাপ তাপ মোহে জরজর হইয়া—হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া—প্রাণের ক্রন্দন জানাইবার জন্য আমরা তোমার চির-উদ্ঘাটিত দুয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; একবিন্দু শান্তিবারি দিয়া শোকে বিহ্বল, পাপে মলিন, দীন হীন সন্তানকে তোমার মহাসিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। আমাদের বল নাই, আশা নাই, ভরসা নাই। তুমি যে বল দিয়াছিলে সংসারের ছলনা-অন্ধকারে মুগ্ধ হইয়া সে বল কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন অবসন্নহৃদয়ে কাতর প্রাণেকরুণামৃত লাভ করিবার জন্য ভিখারী-বেশে তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। অবনত মস্তক উন্নত করিয়া তুলিবার আর সামর্থ্য নাই—পঙ্কিল কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে জীবনের শান্তির সমাধি রচনা করিয়াছি। এখন ক্রন্দন মাত্র সম্বল। মৃত্যু ধীরে ধীরে আমাদিগকে সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যার পাষাণ স্তূপে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই চির-ধ্রুব অটল আশ্রয় ছাড়িয়া—ভূলোক দ্যুলোকের প্রতিষ্ঠাভূমি ছাড়িয়া—সেই ভূমানন্দ পরিপূর্ণপ্রেম ছাড়িয়া—বালক আমরা বুঝিবার দোষে হলাহল-সাগরে ডুবিয়াছি; দয়াময়! আমাদের কি উদ্ধার নাই? হৃদয়ে সত্যের আলোক নিভাইয়া দিয়া আমরা এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—প্রাণের মধ্যে, আত্মার মধ্যে সতত যে মহান্ আশ্রয় রহিয়াছে অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাই না। হতাশচিত্তে মৃত্যুকে আশ্রয় বলিয়া আলিঙ্গন করি—তাহার অধরৌষ্ঠের সাদর-সম্ভাষণী হাসিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তখন পাপকেই সুখ বলিয়া ভ্রম হয়—মিথ্যার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মনে করি, তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধিত হইল। এখন দেখিতেছি মৃত্যু আমাদিগকে তাহার পদসেবায় নিযুক্ত করিয়াছে—হিম মৃত্যুর স্পর্শে আমরা জরজর।

এখন আর প্রাণে উৎসাহ নাই—হৃদয়ে আশা নাই। মিথ্যার উপাসনা আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়াছে। আমাদের পানে বিভীষিকা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। তোমার প্রসন্ন মুখ পাপমলিন হৃদয় আর অনুভব করিতে পারে না। তোমার নামে সে অন্ধকারে লুকাইতে চায়—জানে না যে অন্ধকারের মধ্যেও মাতার স্নেহ আঁখি জাগিয়া থাকে। এই যে মুক্ত আকাশ—এই যে প্রাণপূর্ণ বিশ্ব ইহা তাহার নিকট বিভীষিকা। আমরা এতদূর নামিয়াছি যে মাতার নামে শিহরিয়া উঠি। কানাকানি, দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দার মধ্য দিয়া আমরা পাপের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু তোমার সন্তান হইয়া পাপের পদসেবায় জীবন অতিবাহিত করিব কিরূপে? আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি আমাদিগকে পাপের মধ্যে পুণ্য, বিষাদের মধ্যে শান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সংযম শিক্ষা দিয়াছ। আমাদের মঙ্গলের জন্যই পাপের রাজ্যে কণ্টক বন সৃষ্টি করিয়াছ। সেই কণ্টক বনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি—নাথ! রোগীকে তোমার পুণ্য স্পর্শে পবিত্র কর।

সন্তান আজ ভিখারীবেশে মাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া—মায়ের সম্মুখেও জড়সড় সঙ্কুচিত ভাব। প্রসন্নমুখে তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছ—মলিন হৃদয় লইয়া তোমার ক্রোড়ে যাইতে সাহস হইতেছে না। তুমি মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে সাধু শিক্ষা দিবে জানি—জানি, কঠোর পীড়ন তোমার উদ্দেশ্য নহে—অমঙ্গলের ছায়ার মধ্য দিয়া তুমি মঙ্গলের পথে লইয়া যাও, কিন্তু ছদ্মবেশী মোহের ছলনায় এখনও ভুলিয়া আছি—এখনও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সন্নিধানে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। পদে পদে দুর্ব্বল হৃদয় চমকিয়া উঠে। তোমার শান্তিনিকেতনেও সে পৃথিবীর ধূলি বহিয়া আনে। দয়াময়! রক্ষা কর—নহিলে মোহ বন্ধনে জীবন অবসান হয়।

পাপে মোহে আমরা ডুবিয়াছি। আমাদের উদ্ধার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তোমার করুণাই আমাদের জীবন। আমরা তোমার আদেশ শতবার লঙ্ঘন করিয়াছি—মার্জ্জনা করিয়া তুমি আমাদিগকে উন্নত শিক্ষা দিয়াছ। তুমিই আমাদিগকে রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে চিরদিন রক্ষা করিতেছ। তাই আজ দিনান্তে পাপতাপে জরজর হইয়া তোমারই দুয়ারে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান করিতেছ—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান কর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

আত্মাতেই যাঁহাদের পুরুষার্থ ব্রহ্ম তাঁহাদেরই প্রাপ্য, যাহারা বহির্বিষয়ে নিমগ্ন সেই সমস্ত দুরাশয় তাঁহাকে কখন জানিতে পারে না। প্রত্যুত এক অন্ধ অন্য অন্ধ দ্বারা নীয়মান হইয়া যেমন গর্ত্তে পতিত হয় সেইরূপ এই সকল লোক বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে গমন করে। যাবৎ বিষয়াভিলাষশূন্য মহত্তম ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন না হয় তাবৎ এই সকল লোকের বুদ্ধি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কখনও অসম্ভাবনা ও কখন বা বিপরীত ভাবনা দ্বারা বিহত হয় এবং ইহা কদাচ তাঁহার

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। ফলত মহত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষও হয় না। এই বলিয়া প্রহ্লাদ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় দেশ হইতে ভূতলে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন এবং রোষরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ঘাতকগণ শীঘ্র ইহাকে বাহিরে লইয়া যাও এবং শীঘ্রই ইহার প্রাণসংহার কর। যখন এই দুরাত্মা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দাসবৎ বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে তখন এ অবশ্যই আমার বধ্য। যদি একজন পরও ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয় তবে সেইই পুত্র, আর ঔরস পুত্রও যদি ব্যাধির ন্যায় অহিতকারী হয় তবে তাহাকে পরই বলিয়া জানিবে। ইহাও তো দূরের কথা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটী যদি আপনার অনিষ্টকর হয় তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিবে, কারণ উহা ছিন্ন হইলে অপর গুলি সুখে জীবিত থাকিতে পারে। মুনির পক্ষে দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন শত্রু সেইরূপ এই দুর্ব্বৃত্ত আমার ছদ্মবেশী শত্রু, অতএব যে কোনও উপায়ে হউক ইহাকে বধ কর।

দৈত্যপতির আদেশমাত্র তাম্রশ্মশ্রু তাম্রকেশ বিকটদণ্ড বিকটমুখ ঘাতকেরা মার মার রবে শূলহস্তে উপস্থিত হইল। এবং প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থলে সুতীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার চিত্তনির্ব্বিকার অনির্দ্দেশ্য বিশ্বাত্মা ব্রহ্মে সমাহিত। ব্রহ্মতেজে শূলপ্রহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

তখন দৈত্যপতি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং অন্যান্য উপায়ে প্রহ্লাদকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইল। এইরূপে যখন তিনি সেই নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণবধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমি ইহাকে অনেক অসাধু বাক্যে ভৎর্সনা করিয়াছি, বিবিধ উপায়ে বধের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এ স্বতেজে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই বালক আমার অদূরে দণ্ডায়মান কিন্তু নির্ভয়। কিছুতেই ইহার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আশ্চর্য্য, মৃত্যুও ইহার ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী নয়। ইহার প্রভাব নিতান্ত অপরিমেয়। এই বালকের সহিত বিরোধ করিয়া নিশ্চয় আমাকেই মরিতে হইবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অধোমুখে যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দৈত্যগুরু শুক্রের পুত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন দানবরাজ, তুমি সর্ব্ববিজয়ী, তোমার ভ্রূভঙ্গীতে ভয় না করে এমন কেহই নাই। সুতরাং তোমার এইরূপ দুশ্চিন্তার বিষয় আমরা কিছুই দেখি না। আর দেখুন বালকদিগের কার্য্যে গুণ দোষ গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষণে তুমি প্রহ্লাদকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ। যেন কোনরূপে কোথাও পলাইয়া না যায়। দেখ পুরুষের বুদ্ধি বয়সে ও সাধুসঙ্গে সমীচীন হইয়া থাকে।

তখন দৈত্যপতি গুরুপুত্রের কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন ভালই; তবে তোমরাও ইহাকে গৃহী রাজার ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। অনন্তর প্রহ্লাদ ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গে উপদিষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু যাঁহারা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন ঐ সমস্ত শিক্ষা তাঁহাদের

মুখনির্গত, প্রহ্লাদের কিছুতেই তাহা ভাল বোধ হইল না।

অনন্তর একদা শুক্রাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বয়স্য বালকদিগের সহিত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন।

ঐ সময় পরম কারুণিক প্রহ্লাদ সহচর দৈত্যবালকদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ একেতো এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, পরজন্মে এই যোনি লাভ হইবে কি না সন্দেহ। অতএব ইহজন্মে কৌমার অবস্থাতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বিষ্ণু সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা প্রভু ও সুহৃৎ, অতএব তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। দেহীদিগের দেহযোগ বশত দৈবাৎ ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখ অযত্নসম্ভূত। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রয়াস অকর্ত্তব্য, ইহাতে কেবল আয়ুক্ষয় হয়। আর বিষ্ণুকে ভজনা করিলে যে কল্যাণলাভ হয় ইহা দ্বারা কোনও মতে তাহা হইতে পারে না। অতএব এই জন্মে যাবৎ শরীর না নষ্ট হয় তাবৎ কল্যাণ লাভার্থ যত্ন করিবে। একে তো আয়ু শতবর্ষমাত্র, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস তাহাদের ইহারও অর্দ্ধেক, রাত্রিকালে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ নিদ্রিত থাকি সে কালটুকু তো নিস্ফল, বাল্য ও কৈশোরে অনর্থক ক্রীড়া কৌতুকে বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, আর জরা দেহে প্রবেশ করিলে আবার ঐরূপ বিংশতি বর্ষ নিরর্থক যায়। আয়ুর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও গৃহাসক্ত প্রমত্ত হীর দুঃখপূর্ণ কামনা ও বলীয়ান মোহে ব্যয়িত হয়। বল দেখি কোন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সুদৃঢ় স্নেহপাশবদ্ধ সংসারাক্ত আপনাকে সংসার হইতে বিমুক্ত রিতে উৎসাহী হয়। বলদেখি তস্কর সেবক ও বণিক প্রিয়তর প্রাণ অপেক্ষাও অভীষ্ট যে অর্থ প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও ক্রয় করে কোন্ পুরুষ সহজে সেই অর্থতৃষ্ণা ছাড়িতে পারে। যে ব্যক্তি দয়া স্নেহে পালিত প্রিয়তমার নির্জনসঙ্গ ও মনোহর আলাপে আত্মবিস্মৃত, যে আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বদ্ধ, যাহার মন মধুরাস্ফুটভাষী শিশুতে অনুরক্ত, যে মনোজ্ঞ উপকরণে সজ্জিত গৃহসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, যে কুলক্রমাগত জীবিকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং যাহার চিত্তে এই সমস্ত সততই জাগরূক তাহার কিরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। কোনকারী কীট যেমন গৃহ নিম্মাণ করিয়া আপনার নির্গমন দ্বার পর্য্যন্ত রাখে না সেইরূপ কর্ম্মবাসনা এই সমস্ত লোককে বদ্ধ করিতেছে, ইহাদের বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের লোভ অতিমাত্র প্রবল সুতরাং কিছুতেই কামনার শান্তি নাই, ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের বহুমত এবং সংসারমোহ যার পর নাই দুর্দ্দম, বল দেখি এই সকল লোকের মনে কিরূপে বৈরাগ্য আসিবে। এইরূপ ভোগ বিলাসে যে নিজের আয়ু ও পুরুষার্থ নষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রমাদী চিত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা ত্রিতাপে তাপিত কিন্তু স্ত্রী পুত্রের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ নিবন্ধন ইহাদের মনে কিছুতেই বৈরাগ্য আইসে না। প্রত্যুত এই সকল লোকই ক্রমশ দুরাচার অসৎ হইয়া উঠে। এই স্ত্রীপুত্রানুরাগবশত কেবল অর্থেতেই ইহাদের তৃষ্ণা বলবতী হইতে থাকে। পরস্বাপহারীর ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের দুর্জয়তা ও কামনার অশান্ততা হেতু ইহারা পরস্বাপহরণ করে।

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। ফলত মহত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষও হয় না। এই বলিয়া প্রহ্লাদ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় দেশ হইতে ভূতলে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন এবং রোষরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ঘাতকগণ শীঘ্র ইহাকে বাহিরে লইয়া যাও এবং শীঘ্রই ইহার প্রাণসংহার কর। যখন এই দুরাত্মা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দাসবৎ বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে তখন এ অবশ্যই আমার বধ্য। যদি একজন পরও ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয় তবে সেইই পুত্র, আর ঔরস পুত্রও যদি ব্যাধির ন্যায় অহিতকারী হয় তবে তাহাকে পরই বলিয়া জানিবে। ইহাও তো দূরের কথা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা যদি আপনার অনিষ্টকর হয় তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিবে, কারণ উহা ছিন্ন হইলে অপর গুলি সুখে জীবিত থাকিতে পারে। মুনির পক্ষে দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন শত্রু সেইরূপ এই দুর্ব্বৃত্ত আমার ছদ্মবেশী শত্রু, অতএব যে কোনও উপায়ে হউক ইহাকে বধ কর।

দৈত্যপতির আদেশমাত্র তাম্রশ্মশ্রু তাম্রকেশ বিকটদণ্ড বিকটমুখ ঘাতকেরা মার মার রবে শূলহস্তে উপস্থিত হইল। এবং প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থলে সুতীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার চিত্তনির্ব্বিকার অনির্দ্দেশ্য বিশ্বাত্মা ব্রহ্মে সমাহিত। ব্রহ্মতেজে শূলপ্রহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

তখন দৈত্যপতি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং অন্যান্য উপায়ে প্রহ্লাদকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইল। এইরূপে যখন তিনি সেই নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণবধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমি ইহাকে অনেক অসাধু বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়াছি, বিবিধ উপায়ে বধের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এ স্বতেজে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই বালক আমার অদূরে দণ্ডায়মান কিন্তু নির্ভয়। কিছুতেই ইহার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আশ্চর্য্য, মৃত্যুও ইহার ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী নয়। ইহার প্রভাব নিতান্ত অপরিমেয়। এই বালকের সহিত বিরোধ করিয়া নিশ্চয় আমাকেই মরিতে হইবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অধোমুখে যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দৈত্যগুরু শুক্রের পুত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন দানবরাজ, তুমি সর্ব্ববিজয়ী, তোমার ভ্রূভঙ্গীতে ভয় না করে এমন কেহই নাই। সুতরাং তোমার এইরূপ দুশ্চিন্তার বিষয় আমরা কিছুই দেখি না। আর দেখুন বালকদিগের কার্য্যে গুণ দোষ গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষণে তুমি প্রহ্লাদকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ। যেন কোনরূপে কোথাও পলাইয়া না যায়। দেখ পুরুষের বুদ্ধি বয়সে ও সাধুসঙ্গে সমীচীন হইয়া থাকে।

তখন দৈত্যপতি গুরুপুত্রের কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন ভালই; তবে তোমরাও ইহাকে গৃহী রাজার ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। অনন্তর প্রহ্লাদ ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গে উপদিষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু যাঁহারা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন ঐ সমস্ত শিক্ষা তাঁহাদের

মুখনির্গত, প্রহ্লাদের কিছুতেই তাহা ভাল বোধ হইল না।

অনন্তর একদা শুক্রাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বয়স্য বালকদিগের সহিত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন।

ঐ সময় পরম কারুণিক প্রহ্লাদ সহচর দৈত্যবালকদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ একেতো এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, পরজন্মে এই যোনিলাভ হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব ইহজন্মে কৌমার অবস্থাতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বিষ্ণু সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা প্রভু ও সুহৃৎ, অতএব তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। দেহীদিগের দেহযোগ বশত দৈবাৎ ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখ অযত্নসম্ভূত। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রয়াস অকর্ত্তব্য, ইহাতে কেবল আয়ুক্ষয় হয়। আর বিষ্ণুকে ভজনা করিলে যে কল্যাণলাভ হয় ইহা দ্বারা কোনও মতে তাহা হইতে পারে না। অতএব এই জন্মে যাবৎ শরীর না নষ্ট হয় তাবৎ কল্যাণ লাভার্থ যত্ন করিবে। একে তো আয়ু শতবর্ষমাত্র, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস তাহাদের ইহারও অর্দ্ধেক, রাত্রিকালে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ নিদ্রিত থাকি সে কালটুকু তো নিস্ফল, াল্য ও কৈশোরে অনর্থক ক্রীড়া কৌতুকে িংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, আর রা দেহে প্রবেশ করিলে আবার ঐরূপ িংশতি বর্ষ নিরর্থক যায়। আয়ুর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও গৃহাসক্ত প্রমত্ত হীর দুঃখপূর্ণ কামনা ও বলীয়ান মোহে ্যয়িত হয়। বল দেখি কোন অজিতে- দ্রিয় পুরুষ সুদৃঢ় স্নেহপাশবদ্ধ সংসারা- ক্ত আপনাকে সংসার হইতে বিমুক্ত িতে উৎসাহী হয়। বলদেখি তস্কর সেবক ও বণিক প্রিয়তর প্রাণ অপেক্ষাও অভীষ্ট যে অর্থ প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও ক্রয় করে কোন্ পুরুষ সহজে সেই অর্থতৃষ্ণা ছাড়িতে পারে। যে ব্যক্তি দয়া স্নেহে পালিত প্রিয়তমার নির্জনসঙ্গ ও মনোহর আলাপে আত্মবিস্মৃত, যে আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বদ্ধ, যাহার মন মধুরাস্ফুটভাষী শিশুতে অনুরক্ত, যে মনোজ্ঞ উপকরণে সজ্জিত গৃহসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, যে কুলক্রমাগত জীবিকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং যাহার চিত্তে এই সমস্ত সততই জাগরূক তাহার কিরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। কোসকারী কীট যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নির্গমন দ্বার পর্য্যন্ত রাখে না সেইরূপ কর্ম্মবাসনা এই সমস্ত লোককে বদ্ধ করিতেছে, ইহাদের বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের লোভ অতিমাত্র প্রবল সুতরাং কিছুতেই কামনার শান্তি নাই, ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের বহুমত এবং সংসারমোহ যার পর নাই দুর্দ্দম, বল দেখি এই সকল লোকের মনে কিরূপে বৈরাগ্য আসিবে। এইরূপ ভোগ বিলাসে যে নিজের আয়ু ও পুরুষার্থ নষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রমাদী চিত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা ত্রিতাপে তাপিত কিন্তু স্ত্রী পুত্রের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ নিবন্ধন ইহাদের মনে কিছুতেই বৈরাগ্য আইসে না। প্রত্যুত এই সকল লোকই ক্রমশ দুরাচার অসৎ হইয়া উঠে। এই স্ত্রীপুত্রানুরাগবশত কেবল অর্থেতেই ইহাদের তৃষ্ণা বলবতী হইতে থাকে। পরস্বাপহারীর ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের দুর্জয়তা ও কামনার অশান্ততা হেতু ইহারা পরস্বাপহরণ করে।